দূরের দুপুর

বুদ্ধদেব গুহ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৮

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক
অবনীমোহন রায়
তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১২ বিনোদ সাহা লেন
কলকাতা-৬

মৌটুসীকে

লেখকের অন্যান্য বই :

স্বগতোক্তি
চবুতরা
লবঙ্গীব জঙ্গলে
প্রথমাদের জন্যে
জঙ্গল মহল
বনবাসব
হলুদ বসন্ত
নগ্ন নির্জন
সুখের কাছে
জঙ্গলেব জার্ণাল,
ঋজুদাব সঙ্গে জঙ্গলে
পারিধি
কোয়েলের কাছে
একটু উষ্ণতাব জন্যে
খেলা যখন
বাতিঘর
ঝাঁকি দর্শন
পহেলী পেয়ার

প্রথম অধ্যায়



বুদুস, শীগগীর পালা, ঐ দ্যাখ্ কি রকম অবস্থা আকাশের। পুঁটুর কথা শেষ হবার আগেই আদিগন্ত নরম সবুজ ধানের ক্ষেতের গালচেয় জোলো হাওয়ার দূরাগত বৃষ্টির গন্ধ পেল বুদুস। দু'বন্ধুতে তাড়াতাড়ি খেপ্‌ল। জাল দুটো কাঁধে ফেলে বাড়ির দিকে ছুট্ লাগাল। কিন্তু ছুটলে কি হয়? বৃষ্টি যেন পুলিসের কুকুরের মত ওদের পেছন নিল।

দৌড় দৌড়—দে দৌড়—দৌড়।

দৌড়লে হবে কি? রাস্তা তো কম নয়।

কুলতলার পাশ দিয়ে শংকামারীর রাস্তা পেরিয়ে এসে পেছনের বাগানের কাছে পৌঁছলে(?) যাবে। পুঁটুর তো আরো দূরে যেতে হবে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দুজনে ছুটছে।

এবারে চট্‌পটিয়ে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। মানকচুর পাতায়, আমগাছের ডালে, ঘোলা জলের ক্যানেলের উপর।

দেখতে দেখতে চালতাতলার মোড়ে পৌঁছল ওরা।

দৌড়তে দৌড়তে পুঁটু হাত নেড়ে বলল, কাল স্কুলে দেখা হবে বুদুস—বলেই, ও ডানদিকে মোড় নিয়ে আরো জোরে দৌড়ল।

বুদুস বাঁদিকে এগিয়ে চলল। এখনো বেশ খানিকটা যেতে হবে। চার পাশের ঘাস-পাতারা ভিজে হাওয়ায় হেলছে দুলছে। হিস্-হিস্ ফিস্‌ফিস্ শব্দ হচ্ছে। গুড়্-গুড়্ করে সারা-আকাশে মেঘেরা ভারী পায়ে গুড়ু-গুড়ু রবে এক্কা-দোক্কা খেলে বেড়াচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারছে। কে বলবে, এই আধ ঘণ্টা আগেও আকাশে কাঁসা রঙের রোদ্দুর রন্‌রন্ করছিল।

দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ চোখে পড়ল সেই বড় বাঁশ-ঝাড়টি—বুহুসদের বাড়ির পেছনের দরজার কাছে। ওর মনে হত আকাশ সমান উঁচু। ওর মধ্যে শঙ্খচূড় সাপের বাসা ছিল। হাওয়া দিলেই মিচ্‌-মিচ্‌ ফিস্‌-ফিস্‌ নানারকম আওয়াজ বেরোত তার থেকে। ভূত বুহুস দেখেনি—কিন্তু কেন জানে না অন্ধকারে কি আধো-অন্ধকারে বুহুসের বড় ভয় লাগত ঐ নির্জন ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটা পেরোতে। তার উপর এখন তো বৃষ্টি পড়ছে।

একটি গোলা-কাঁঠাল গাছের নীচে থমকে দাঁড়াল বুহুস। পাশের অশ্বত্থ-গাছে একটি দাড়িওয়ালা ভিজে সপ্‌সপ্‌ খয়েরী বক পাখা ঝট্‌-পটিয়ে উঠল। বুহুসের ভীষণ ভয় করতে লাগল। পরমুহূর্তেই মনস্থির করে ফেলে দু-চোখ বন্ধ করে পেছনের দরজা লক্ষ্য করে প্রাণপণ দৌড় লাগাল।

দরজা পেরিয়েই পেছনের উঠোনে ঢুকল কি না তা জানে না ও, কিন্তু কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল বুহুস—ধপ্‌ আওয়াজ হল একটা—চোখ না খুলেই গায়ের গন্ধ শুঁকেই বুহুস বুঝতে পারল এ আর কিছু নয়—তাদের দুধেল গাই ফুলমণি। সঙ্গে সঙ্গে সব ভয় উবে গেল। চোখ মেলে চাইল। ফুলমণিও ভিজে গেছে। কালো চোখ দুটি চিক্‌চিক্‌ করছে। ফুলমণির কপালে চুঃ করে একটি চুমু খেয়ে বুহুস দৌড়ে গিয়ে বড়ঘরের বারান্দায় উঠল।

ফুলমণি এক-পা এক-পা করে গোয়ালঘরের দিকে চলে গেল।

কি হল? ছেলের মাছ ধরা হল?

রান্নাঘরের দাওয়া থেকে মা বললেন।

জালটাকে দাওয়াতে ঝোলানো বাঁশের তাকে রাখতে রাখতে লাজুক-লাজুক মুখে বুহুস বলল—নাঃ, পেলাম না।

ঠাকুরমা পুবের ঘরের দাওয়ায় পাকা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে মালা জপ করছিলেন, বললেন—খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ঝড়ে-জলে না-গেলেই নয় ছেলের। তুই কি মাছ ধরে খাবি?

বুহুস উত্তর দিল না। ঘরের ভেতর ঢুকে গামছা এনে মাথা মুছতে লাগল।

কীরে? ক্ষিদে পায়নি? কিছু খাবি না?

হ্যাঁ।

তবে দৌড়ে চলে আয় উঠোন পেরিয়ে। এতটুকু ভিজলে কিচ্ছু হবে না।

বুহুস দৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসল। মা কাঁসার জামবাটিতে করে আমের আঁচারের তেল দিয়ে গরম গরম মুড়ি-মাখা আর কাঁঠালের বীচি-ভাজা খেতে দিলেন। তারপর মা একদৌড়ে বৃষ্টির মধ্যে উঠোন পেরিয়ে বড়ঘরে চলে গেলেন। এখন শাঁখ বাজিয়ে সন্ধ্যা-পুজো করবেন মা।

বুহুস কাঠের পিঁড়িতে বাবু হয়ে বসে কাঁঠাল-বীচি ভাজা দিয়ে মুড়ি খেতে খেতে বৃষ্টি দেখতে লাগল আর ভাবতে লাগল।

চুপ করে বসে ভাবতে বুহুসের ভারী ভাল লাগে। কত কী ভাবে বুহুস—কত কী ভাবে!

রান্নাঘরের পাশে একটা কাগজী লেবুর গাছ। পশ্চিমা চাকর মানসি বলত, 'কুঁইয়া কা পানি'। এত রস হত লেবুগুলোয়। ডানদিকে কুঁয়োতলা। বাঁধানো। পাশে চান করার ঘর। বাঁখারী দিয়ে ঘেরা ওটা কেবল মেয়েদের জন্যে। মা চান করতেন, ঠাকুমা চান করতেন, নতুন কাকীমা চান করতেন। দু-একবার ওর ভেতরে ঢুকেছে বুহুস—একা-একা দুপুরবেলা। কেমন একটা নিষিদ্ধ ভাব, করমচা করমচা একটা গন্ধ, ভিতরটা ভীষণ নির্জন, ভাল লাগেনি বুহুসের।

কুয়োতলার পাশেই সিঁদুরে আমের গাছটি। কালবৈশাখীর সময়ে নতুন কাকিমার গালের মত লাল-টুকটুক্ আম ঝরে পড়ে নীচে। কত খেয়েছে বুহুস। এখন বৃষ্টিতে জলের বর্ষাতি মুড়েই ভিজছে।

বেশ ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। টিনের ছাদে টুপুর-টাপুর টাপুর-টুপুর করে আওয়াজ হচ্ছে। ছাদ গড়িয়ে উঠোনময় জল পড়ছে। প্রত্তিটি ঘরের দাওয়ার পাশে জল পড়ে পড়ে ছোট ছোট গুলিখেলার গর্তের

মত গর্ত হয়ে গেছে। সেগুলি এখন জলে ভর্তি। তার উপর টুপ্‌টাপিয়ে জল পড়ছে। দাওয়া ঘেঁষে ঘেঁষে ব্যাঙের ছাতা হয়েছে অনেক। টকপাতার গাছ, ছোট ছোট গোল গোল নীলচে সবুজ পাতা, যা খেতে না; ভীষণ ভাল।

একটু পরেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ঘুট-ঘুট করবে অন্ধকার। ঘরে ঘরে মানসিং লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে যাবে। বাইরে ঝিঁঝিঁ ডাকবে, ঝিঁঝিঁ··· ঝিঁঝিঁ···। বাইরে ঝিঁঝিঁ ডাকলেই বুতুসের পেছনের দরজার পাশের বাঁশঝাড়ের কথা মনে পড়ে যায়। খুব ইচ্ছে করে এই অন্ধকারে একবার গিয়ে দেখে, শঙ্খচূড় সাপেরা এখন কি করছে। বড় হলে একবার যাবেই ঠিক করেছে। তখন বাবার মত বন্দুক ছুঁড়তে শিখবে। সাপ, শেয়াল, কাঁকড়া-বিছে কিছুকে সে তখন ভয় পাবে না।

একটু পরে মা রান্নাঘরের ভিতরে ডাকবেন। 'আংকল টমস্‌ কেবিন' নিয়ে বুতুস মা-র পাশে বসে উনুনের আলোয় পড়বে। টমকাকার দুঃখে বুতুসের চোখে জল গড়াবে।

তারপর রান্না হয়ে যাবে। আজ খুব বৃষ্টির রাত। খিচুড়ি, ডিম-ভাজা, কড়কড়ে করে আলু-ভাজা, গরম-গরম ঘি। বৃষ্টি না হলে কোন ছোট মাছের ঝোল আর ক্ষেতের ধানের মিষ্টি ভাত।

তারপর ঘুম।



বড়রা আলোচনা করেন কলকাতায় নাকি যুদ্ধ। জাপানীরা বোমা ফেলছে। শহর শ্মশান। বুতুস ভাবে ভাগ্যিস কোলকাতায় যুদ্ধ। নইলে কি আর রংপুরে এসে এমনি করে থাকা হত? রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর বাড়িতেই এখন থাকত।

এত যে পাখি আছে, এত যে গাছ আছে, পাতা আছে, লতা

আছে, ফুল আছে, এত যে প্রজাপতি আছে, কুঁচফল আছে, এসব কিছুই জানত না। একলা দুপুরের গোঁ-গোঁ করা ট্রামের আওয়াজ শুনত শুধু; শুধু মানুষ দেখত। যা হয়েছে ভালই হয়েছে। কষ্ট হয় কেবল বাবার জন্যে। বাবা বেচারা একা একা কোলকাতায় পড়ে আছেন। সরকারের চাকরি, তার নাকি বিষম দায়। না থাকলেই চলে না।

কেন যুদ্ধ? কিসের যুদ্ধ? এত সব বুতুস জানে না। তবে রংপুরে আসার আগে বোমা পড়া দেখেছে বুতুস্ কলকাতায়। যেদিন খিদিরপুরে বোমা পড়ল, সেদিন সেজকাকুর সঙ্গে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রুপোলি চিক্‌চিকে বোমা পড়তে দেখেছিল বুতুস। বোমাগুলো সকালের রোদ্দুরে হাওয়া কেটে রুপোলি চিলের মতো ডাইভ দিচ্ছিল নীচে। তারপর আওয়াজ হচ্ছিল, বুম্ বুম্। অনেক নাকি লোক মরেছিল। তারপরই ইভাকুয়েশান। পিল্ পিল্ করে লোক কোলকাতা ছেড়ে চলে গেছিল।

ভালই হয়েছে বুতুস রংপুরে আছে।

বাবা সেই এসেছিলেন প্রায় দু'তিন মাস আগে। যখন বড়কাকুর বিয়ে হল। বিয়ে হল ফরিদপুরে—পরাশর গ্রামে। সে কী ব্যাপার। ভাবলেই মজা লাগে বুতুসের।

গার্লস স্কুলের বাস রিজার্ভ করে স্টেশনে যাওয়া হল। কত লোক। কত মজা। বড়কাকু বিয়ের আগের দিন বুতুসকে বাজারে নিয়ে গিয়ে নতুন প্যাণ্ট শার্ট কিনে দিলেন। বুতুসের খাতিরই আলাদা। সে যে নিতবর। প্যাণ্টটার রঙ ছিল কালোর উপর সাদা সরু সরু ডোরা। এখনও মনে আছে।

পোড়াদহ স্টেশনে গাড়ি বদল করে ফরিদপুর যাওয়া হল। ফরিদপুর স্টেশন থেকে ঘোড়াগাড়ির প্রসেশন করে পরাশর গ্রামে। পথে যেন কোন্ গাড়ির একটি চাকা খুলে গড়িয়ে পাশের পুকুরে পড়ল। কী কেলেঙ্কারী; কী কেলেঙ্কারী। মিণ্টুকাকুর কপাল ফুলে গেল সুপুরীর মত। সেই এ্যাক্‌সিডেণ্টে।

বিয়ে-বাড়ি গিয়ে যখন পৌঁছনো হল তখন হৈ হৈ পড়ে গেল। বরযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা আগে পৌঁছে ছিলেন তাঁরাও এগিয়ে এলেন। বসবার ঘরের সামনে ডাবের পাহাড় করা রয়েছে। তখন তো আর কোকাকোলা ছিল না। বাড়ির বাইরে এক মহল, ভিতরে আর এক মহল। বাইরের মহলের বসবার ঘরে বিরাট ফরাস পাতা— তাকিয়া গড়াগড়ি যাচ্ছে এদিক-ওদিক। বরের জন্যে আলাদা আয়োজন।

কে যেন এসে বলল, কাকিমাকে দেখবে না? এস।

তারপর হাত ধরে ভিতর-বাড়িতে নিয়ে গেল বুহুসকে। সেখানে কত লোক। বেশীর ভাগই মেয়ে। একটি ছোট মেয়ে উঠোনে, যেখানে ছাদের টিন বেয়ে জল পড়ে পড়ে ছোট ছোট গর্ত হয়েছে সেইখানে একা একা বসে খেলা করছিল। সেই ভদ্রলোক বললেন, এর নাম শীলা, এ তোমার কাকীমার বোন। শীলা খুব সপ্রতিভভাবে বেণী ঝাঁকিয়ে বলল, দিদির কাছে যাবে? চল, নিয়ে যাচ্ছি।

ছোট ঠাকুরঘর। বাইরে থেকেই ধূপের গন্ধ, চন্দনের গন্ধ, ফুলের গন্ধ বাতাসা-কদ্‌মার গন্ধ ভেসে আসছে। ঠাকুমার ঠাকুরঘরেও ঠিক এই রকম গন্ধ আছে। ঘরে না ঢুকেই বলতে পারে বুহুস কোন্‌টি ঠাকুরঘর। শীলা হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গিয়ে কাকিমার কাছে পৌঁছে দিল।

ইস্‌, কি ভাল যে দেখতে—মনে মনে বলল বুহুস।

বড়কাকুর চেয়ে কিন্তু অনেক ছোট—কিন্তু কি সুন্দর হলদে হলদে গোলাপি গোলাপি রঙ—কি সুন্দর উঁচু নাক—কি রকম টানা টানা চোখ আর কী যে চুল, সে কি বলবে। হাঁটুর নীচ অবধি চুল গড়িয়ে পড়েছে। এক্ষুনি চান করেছে কাকীমা। একটি গরদের শাড়ি পরেছে।

কাকীমা বুহুসকে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন।

ভীষণ লজ্জা করতে লাগল বুহুসের—কাকীমার গায়ে এমন একটা সেণ্ট সেণ্ট গন্ধ না—কাকীমার গাটা ভীষণ ঠাণ্ডা, ধানক্ষেতের হলুদ ব্যাঙেদের মত—আর ভীষণ মোলায়েম গা, সিল্কের শাড়ির চেয়েও

মোলায়েম। লজ্জা করতে লাগল বুড়ুসের, আবার ভালও লাগতে লাগল।

কি নাম তোমার?

বুড়ুস।

ভাল নাম বল।

ভাল নাম নিজন।

নিজন? বাঃ! কেন, নির্জন কেন? কে নাম রেখেছেন তোমার?

দিদিমা।

তাই বুঝি। তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?

ক্লাস থ্রি।

কোন্ স্কুলে?

রংপুর জেলা স্কুল।

দেখি দেখি, আর একটু কাছে এস, তোমার মুখটা আর একটু ভাল করে দেখি—তুমি তো খুব সুন্দর দেখতে। তোমার মা বুঝি খুব সুন্দর?

জানি না।

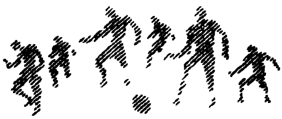
জানো, আমাকে বলছ না।

বুড়ুস বলল, মা-ও সুন্দর, তুমিও সুন্দর।

কাকীমা আবার বুড়ুসকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ওরে দুষ্টু ছেলে!

ভাল লাগায় বুড়ুসের দম বন্ধ হয়ে গেল!

কাকীমা যখন ওকে ছেড়ে দিলেন, শীলা যখন ওকে বাইরের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল তখনো বুড়ুসের মনে হল কাকীমার গায়ের সেই মিষ্টি-মিষ্টি পুজো-পুজো গন্ধ বুঝি তার সমস্ত শরীরে-চুলে মাথায় লেগে আছে। কাকীমাকে ভীষণ ভীষণ ভাল লেগেছে বুড়ুসের।



লিচু গাছের ডালে ডালে প্রচুর লিচু এসেছে। পাকও ধরেছে। বাদুড়ের বড় উৎপাত। বাদুড় জিনিসটাই বুহুসের পছন্দ নয়। যেমন দেখতে, তেমন গায়ে গন্ধ, আর তেমনি স্বভাব। পা ওপর দিকে মাথা নীচুর দিকে দিয়ে কোনো ভদ্রলোকে ঝোলে গাছে গাছে?

গাছে গাছে ক্যানেস্তারার সঙ্গে ঘণ্টা লাগানো হয়েছে কাঠের। দড়ি দিয়ে সেই ঘণ্টাগুলি বাজাতে হয়। জানালা গলিয়ে সে দড়ি ঘরের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। গাছে ঝটাপটির শব্দ শুনলেই শুয়ে শুয়ে বুহুস দড়ির গোছা ধরে টানে—অমনি ঘটা-ঘণ্ ঢং-ঢং করে ক্যানেস্তারাগুলি থেকে ভাঙা আওয়াজ বেরোতে থাকে। ডানা ঝটপটিয়ে বাদুড়গুলি উড়ে পালায়।

আসলে বুহুস শখ করে এই কাজ নিয়েছে। আসলে এই কাজ মানসিংয়ের। মা মানা করেছিলেন। বুহুস কাকুতি করে বলেছে, না মা, মজা লাগে। আমিই করব।

ফলে, প্রথম রাতে ঘুম হয় না বুহুসের। অবশ্য মা যখন শুতে আসেন তখন মা ঐ দড়ি-দড়া জানালা গলিয়ে মানসিংকে দিয়ে দেন। তবু, রাত দশটা অবধি জেগে থাকা মানেই অনেক রাত্তির জাগা।

কোলবালিশটাকে জড়িয়ে বিছানায় একটা ডিগবাজী খেল বুহুস। তারপর চোখ বন্ধ করে শুনল জলপাই গাছে, গোলাপজাম গাছে, আম-কাঁঠাল গাছে অনেক পাখি এসে ডাকাডাকি শুরু করেছে। উঠোনের একধারে কুয়োতলার পাশে হাঁসের ঘর থেকে রুদ্ধ কণ্ঠে তাদের ছেড়ে দেবার জন্যে কাকুতি জানিয়ে হাঁসেরা তাকে ডাকছে। পিট্ পিট্ করে একটু চোখ খুলল বুহুস।

ঘরের টিনের দেওয়ালে অনেক ছোট বড় ফুটো। সেই সব ফুটো

দিয়ে সূর্যের নানা রঙ আলো এসে ক্ষুদে ক্ষুদে সার্চলাইটের মত আধো-অন্ধকার-ঘরময় কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে!

মা এক পাশে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। হাতটা মাথার কাছে দিয়ে। বালিশের নীচে একটি নীল-রঙা খাম। সাদা কাগজে লেখা বাবার চিঠি। বাবা কী যে মাকে এত চিঠি লেখেন বুত্থুস জানে না। সে নিজে জীবনে বাবাকে একটিই চিঠি লিখেছিল, লিখেছিল :

পূজনীয় বাবা,

আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছ? আমাদের ইণ্ডিয়ান রাণার হাঁসের একটি প্রকাণ্ড ডিম হইয়াছে।

ইতি বুত্থুস।

এটুকু বুঝেছে যে, চিঠি লেখা অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং লিখতে বসে, কি লিখবে তা ছাড়া আর যাবতীয় কথা মনে আসে।

মাকে বুত্থুস ভীষণ ভালবাসে। মা সুন্দর বলেই নয়, মা খুব ভাল বলে। মা যখন বিকেলে গা ধুয়ে বড়ঘরের দাওয়ায় মোড়া পেতে বসে নিজে হাতে, সুন্দর করে বানিয়ে এক কাপ চা খান রসিয়ে রসিয়ে, তখন প্রায় দিনই বুত্থুস মা-র কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। মা-র চান করা গায়ের গন্ধ বুত্থুসের ভীষণ ভাল লাগে। মা-র গায়ের সঙ্গে নাক লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মা বলেন, কি হচ্ছে বুত্থুস, চা-টা খেতে দাও। মা চা খাওয়া সেরে কাপ নামিয়ে রাখতেই বুত্থুস এক চুমুকে তলানি শুষে খেয়ে ফেলে কোন কোন দিন। মা ভীষণ বকেন, কোন কোন দিন তাড়া করে যান বুত্থুসকে উঠোন অবধি। বুত্থুস দৌড়তে দৌড়তে বলে, মেরো না মা, কাপে তোমার ঠোঁটের গন্ধ লেগে আছে। আমার ভীষণ ভাল লাগে।

মা লজ্জা লজ্জা মুখ করে ঠাকুমাকে কি কাকীমাকে বলেন, ছেলেটা কী যে করে। পাগল নাকি?

মা চুপ করে শুয়ে আছেন। ঘুমের মধ্যে দেখলে মনে হয় মা স্বপ্ন দেখছেন। কোন মিষ্টি স্বপ্ন! ঘুমের মধ্যে মাকে আরো বেশী সুন্দর লাগে।

খুব লোভ হল বুতুসের, বাবা মাকে রোজ রোজ কি লেখে তা দেখবার। আস্তে আস্তে খাম থেকে চিঠিটা একটু বের করল। শেষ লাইনটি দেখল। বাবার বাংলা হাতের লেখা বুতুসের চেয়েও খারাপ— মোটে পড়া যায় না—ছোটবেলায় মোটেই মনোযোগ দিয়ে হাতের লেখা অভ্যাস করেন নি। বুতুস দেখল লেখা আছে—'আমি স্কিপিং করিতেছি। এইবার যখন বাড়ি যাইব তখন সম্পূর্ণ fit হইয়া যাইব। দেখিও। ইত্যাদি…'।

কী যে লেখেন বাবা যা-তা। এত বড় লোকেরা আবার স্কিপিং করে নাকি? স্কিপিং তো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পার্কে পার্কে করে দেখেছে। মিছিমিছি বাবার মত লোক স্কিপিং করলে সবাই হাসবে না? Fit হইয়া যাইব। Fit কথাটা বুতুসকে ভাবিয়ে তুলল। ঠাকুমা যে বলেন কাশীনাথবাবুর ফিটের ব্যামো—এ কি সেই ফিট? Feet মানে বুতুস জানে! কিন্তু Fit মানে কি? বড়ই চিন্তায় পড়ল বুতুস। তাছাড়া বাবাই বা কেন Fit হওয়া নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন। শখ করে অসুখ-বিসুখ কে করতে চায়?

হাঁসগুলো সমানে প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে চলেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠল বুতুস। দরজা খুলল। আলোয় ঘর ভরে গেল। উঠোনে গিয়ে হাঁসেদের ঘরের দরজা খুলে দিল। ওরা সকলে মুক্তির আনন্দে নাভি থেকে নিশ্বাস তুলে তুলে গলা উঁচু করে ডাকতে লাগল প্যাঁক্—প্যাঁ—এ-এ-এ-ক্—পিঁয়াক্। প্যাঁকা—প্যাঁকা…। তারপর এক লাইনে পেট দুলোতে দুলোতে দুলালদাদের বাড়ির পাশ দিয়ে হরিসভার পুকুরের দিকে ছুটল। বুতুস পিছনে পিছনে দৌড়ল ওদের।

পুকুরপাড়ে জল-পাওয়া কতশত ঘাস গজিয়েছে। একলা ভোরে গঙ্গাফড়িং পিড়িং পিড়িং করে উড়ে বেড়াচ্ছে। বুতুস মিয়াদের বাড়ির সজনের ডালে বসে বৌ-কথা-কও ডাকছে ফুলে ফুলে, বৌ-কথা-কও, বৌ-কথা-কও।

হাঁসগুলো এক এক করে উড়ে গিয়ে জলে পড়তে লাগল—হুস্—

স্-স্—ঝপাং, হুস্-স্-স্-ঝপাং। ভারী মজা লাগে দেখতে বুতুসের। আসলে ওদের এই জলে ঝাঁপিয়ে পড়া দেখতেই রোজ সকালে ওদের সঙ্গে এতখানি পথ আসে বুতুস।

জলে ঢেউ তুলে হাঁসেরা বিলি কেটে-কেটে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বুতুস বাড়ির দিকে ফিরল। সকাল সকাল স্কুল যেতে হবে। আজ হয়েই গরমের ছুটির বন্ধ হবে স্কুল। অনেকদিন ছুটি। ছুটি—ছুটি—অনেক মজা করবে বুতুস।

সোজা লাল পথটি চলে গেছে স্টেশনের দিকে। লাইন পেরিয়ে কারমাইকেল কলেজেও যাওয়া যায়। বুতুসদের বাড়ি পেরিয়ে বাঁদিকে ঐ পথ ধরে গেলে শংকামারীর শ্মশান। পথে খোঁয়ার পড়ে, বাঁদিকে ডানদিকে একটু এগোলেই একটি মোড়। বাঁয়ে ডিমলার রাজার বাড়ি। ডানদিকে মজা ক্যানেলের সাঁকো পেরিয়ে অন্য পথ গেছে। কোথায় গেছে, জানে না ঠিক। আরো সোজা এগিয়ে গেলে বাঁয়ে নর্মাল স্কুলের খেলার মাঠ, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো।

তা পেরোলেই জেলা স্কুলের মাঠ সুরু হল।

ঐটুকুই দৌড় বুতুসের। পথটুকু দিয়ে একলা একলা বই-খাতা হাতে হেঁটে যেতে কী যে ভাল লাগে বুতুসের। আমের গাছে গাছে কচি কচি বোল এসেছে। সকালের রোদে মৌটুশকি পাখি ডালে ডালে নেচে বেড়াচ্ছে। রাস্তার পাশের নর্দমায় ছোট ছোট মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। ঝিকের ডালে বসন্তকৈরি পাখি উলু দিয়ে দিয়ে ডেকে উঠছে। এক-একটি সকাল, এক-একটি দিন না যেন বুতুসের এক-একটি সুরেলা স্বপ্ন।

স্কুলের মাঠটি প্রকাণ্ড। বিরাট উঁচু ভিতের একতলা স্কুল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর—বড় বড় শিকবিহীন জানালা। বাংলা ও ইতিহাসের স্যাররা বুতুসকে খুব ভালবাসেন। স্কুলে যেতে বুতুসের ভাল লাগে।

একদিকে যেমন মজাও লাগছে যে, আজ হয়ে স্কুল ছুটি হয়ে যাবে, তেমনি আবার মনও খারাপ লাগছে যে, আবার অনেকদিন স্কুলে আসা

হবে না। ছেলেদের, স্যারেদের সঙ্গে দেখা হবে না। অবশ্য পুঁটুর সঙ্গে দেখা হবে।

পুঁটুর বাড়ি বুহুসের পাড়াতেই। পাড়ার নাম ধাপ।

গিরীনকাকাদের বাড়ি ছাড়িয়ে আরো এগিয়ে গেলে ডানদিকে সুধীনকাকুদের বাড়ি। বাইরে একটি বড় কাঠটগরের গাছ। দু'বাড়ির পাশেই হরিসভার মাঠ—হরিসভা—হরিসভার পুকুর।

মাঝে মাঝেই অষ্টপ্রহর কীর্তন হত হরিসভায়। 'কহ গৌরাঙ্গ ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে।' খোল-কর্তাল বাজত, গান হত, হরিসভার দালানঘেঁষা কদমগাছ থেকে গোল গোল হলুদ পশমের বলের মত কদমফুল ঝরে ঝরে পড়ত। আসলে, সব কিছু ভাল লাগত বুহুসের। কিছুই খারাপ লাগত না।

ডিমলার রাজবাড়ির সামনেই পাঠশালা। রাজবাড়ির ঘণ্টা বাজত ঢং-ঢঙিয়ে। উঁচু লাল দেওয়ালের ওপাশ থেকে ঘোড়ার গলার স্বর ও পা-ঠোকার আওয়াজ আসত। পাঠশালার ছেলেরা গুটি গুটি শুঁটিক্ষেতের পাশের পথ বেয়ে যাওয়া-আসা করত।

রাজবাড়ির মোড়ে পৌঁছতেই বুহুস দেখল পুঁটু আসছে। ওর জন্যে দাঁড়াল একটু—পুঁটু হাত তুলে দাঁড়াতে বলল। কালো আর সাদা ডোরাকাটা একটা জামা পরেছে পুঁটু, আর কালো প্যাণ্ট।

পুঁটু কাছে আসতে বুহুস বলল—তাড়াতাড়ি আয়, দেরি হয়ে গেছে।

এই তো এলাম। একটু দাঁড়া, দুটো ঝালবিস্কুট কিনি। বলেই পুঁটু দৌড়ে গিয়ে বটগাছতলার মুদির দোকান থেকে শুকনো-লঙ্কা-দেওয়া ঝাল বিস্কুট কিনে আনল দুটো।

কুটুর-কুটুর করে দু বন্ধু খেতে খেতে চলল।

চোখ নাচিয়ে পুঁটু বলল, দারুণ খেতে, না রে?

কথা না বলে মুখ দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ করে বুহুস বলল, হুঁ।

তুই কিন্তু আমাকে একদিনও খাওয়াস না বুহুস।

কি করব বল ভাই—মা আমার হাতে পয়সা দেন না। বলেন, যা দরকার বলবে, কিনে দেব।

বাঃ, তাহলে কি করে হবে? তোর যদি বুড়ির চুল কি ট্যাপারি খেতে ইচ্ছে হয়?

খেতে পাব না।

কেন?

ওগুলো দরকার নয় বলে।

তুই একটা গাধা। মুখভঙ্গী করে পুঁটু বলল। ওগুলোই তো দরকার রে। এসব ছাড়া যা দরকার তা তো এমনিই পাওয়া যায়, তাতে মজা নেই।

তুই পয়সা কোথায় পাস?

বাড়িতে বলিস না। দিদি দেয়। দিদি স্কুলে যায় তো, টিফিনের পয়সা পায়—দিদি তো বড়। জানিস, দিদির না বিয়ে হয়ে যাবে। ঐ জন্যেই মা-বাবা দিদিকে অত ভালবাসে। বলে, দিদি তো পরের বাড়ি চলে যাবে।

বুহুস বলল, তাতে কি? তোরও তো বিয়ে হবে।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল পুঁটু। বলল, কলকাতায় থেকে থেকে তুই একটা ক্যালকেশিয়ান্ হয়ে গেছিস। তোর বুদ্ধি বলে কিছু নেই। ছেলেদের বিয়ে হলে কি ছেলেরা পরের বাড়ি চলে যায়? অন্য বাড়ি থেকে মেয়েরা এসে থাকে। দেখলি না তোর কাকীমা কত কাঁদতে কাঁদতে এল?

বুহুস ভাবল, ঠিকই তো। আসলে বুহুসের বুদ্ধি ঠিকই কম পুঁটুর তুলনায়। আউস ধান কখন লাগাতে হয়, গোলা-কাঁঠালের গাছে বসেই কি করে কাঁঠাল ভেঙে হাতে আঠা না-লাগিয়েও তা খেতে হয়, বুলবুলি পাখির পেছনটি লাল দেখতে হয় কেন, ইত্যাদি তাবৎ দুরূহ দুরূহ প্রশ্নের সমাধান বুহুসের কাছে যখন সমুদ্র পার হবার মত মনে হয়, পুঁটু তখন এক নিমেষে এক-এক কথায় সে সবের সমাধান করে দেয়।

বিস্কুটটা শেষ করে বুহুস বলল, এই পুঁটু, তুই বিয়ে করবি না?

পুঁটুর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, একশোবার করব।

কেন করবি রে? বিয়ে করে কি হয় রে?

আকাশ থেকে পড়ল পুঁটু, বলল, বিয়ে করে কি হয়? নাঃ, তোকে নিয়ে পারা যায় না। বিয়ে না করলে কখনো পুরুষমানুষ হওয়া যায়! আমরা অঙ্কের স্যারকে যেমন ভয় করি বউরা আমাদের তেমনি ভয় করবে। উঠোনে ঢুকে গলাখাঁকারি দিয়ে ডাকব ছোটবৌ, আর অমনি সপ্তমী পুজোর কলাবউয়ের মত ঘোমটা মাথায় কাঁপতে কাঁপতে এসে বউ মাথা নীচু করে দাঁড়াবে। আমি বলব, গামছা কোথায়? চটি কোথায়? এতক্ষণ যে কাছারি করে এলাম তার জন্যে একটুও বুঝ নেই? তারপর পুঁটু বুকে চাপড় দিয়ে যাত্রার রাবণের মত হাঃ হাঃ করে বলল—তা না হলে পুরুষমানুষ!

বুদ্বুসের মাথায় এল না। খালি এইটুকুর জন্যে কাকীমার মত হলদে-হলদে গোলাপি-গোলাপি একটি মেয়েকে বাপের বাড়ি থেকে কাঁদিয়ে নিয়ে আসার কি দরকার?

স্কুলে অনেক হৈ হৈ হল। আজ পড়াশুনা কিচ্ছু হল না। কেবল ফুল, মালা, সন্দেশ, স্যারেদের মিষ্টি মিষ্টি কথা, ছেলেদের ক্লাস সাজানোর প্রশংসা—এই সব হল।

স্কুল থেকে ফেরবার সময় পুঁটু বলল—বুদ্বুস, বিকেলে ফুটবল খেলা দেখতে আসবি আজকে? হারাগাছার সঙ্গে ধাপের ম্যাচ্।

কোথায় রে?

আরে, এই তো নর্ম্যাল স্কুলের মাঠে। আসবি?

তুই আমাকে ডেকে নিস।

ডাকতে-টাকতে পারব না। চারটের সময় চলে আসিস।

চারটের সময় কখন হয় বুদ্বুস জানে না। ওদের বাড়িতে ঘড়ি নেই। বড় কাকুর ও মার রিস্টওয়াচ আছে, তা দেখতে গেলে বা তাঁদের কাছে সময় জানতে গেলে বকুনি খাওয়া অনিবার্য। অতএব মানসিং যখন ফুলমণির দুধ দুইবার জন্যে গোয়ালে যাবে, তখনি চারটে বাজবে বলে ধরে নিতে হবে।

বুতুস বলল, আচ্ছা, আসব।

বাড়ি ফিরতেই ঠাকুমা বললেন, বুতুস, পায়েস খাবি আয়।

পায়েসও রাঁধেন ঠাকুমা। কালো কি সাদা পাথরবাটিতে ঘন লাল দুধের পায়েস ঢালা থাকে। ঘন হয়ে ক্ষীর জমে থাকে ওপরে। বুতুস প্রথমে আঙুলে করে একটু একটু করে চেখে চেখে খায়, তারপর হাপুস্ হুপুস্ করে।

এখন বেলা হয়েছে। ঠাকুমা এখন লিচুগাছের তলার হবিষ্যি-ঘরে। এই ঘরটি বুতুসের বড় প্রিয়। ছোট্ট মাটির একতলা ঘর। উপরে শনে ছাওয়া। তার উপরে টিন। মধ্যে ঠাকুমার রান্না করার তাবৎ যন্ত্রপাতি। বাইরে একটু ছোট্ট গোবর-লেপা দাওয়া। মাঝে মাঝে বাঁশের খুঁটি। সেগুলিতে হেলান দিয়ে বসে বসে ও হাতের ছাপ লেগে লেগে, তেলতেলে লাল হয়ে আছে। ঠাকুমা যখন খেতে বসবেন তখন বুতুসের এখানে এসে একবার বসতেই হবে। ঠাকুমা গরম আতপ চালের ভাত ঘি দিয়ে আলুসিদ্ধ দিয়ে কুচকুচে কালো কাঁচালঙ্কা দিয়ে মেখে দেবেন দলা দলা করে—আর বুতুস দাওয়াতে বাবু হয়ে বসে মনোযোগ দিয়ে খাবে। ঝুর ঝুর করে হাওয়া বইবে, লিচুগাছের শুকনো পাতা ঝরে দাওয়ায় পড়বে—দুটি দাঁড়কাক সারা সকাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কা-খ্যা, কা-খ্যা করে নিশ্বাস ফেলে লাল দগদগে গলা দেখিয়ে ডাকবে। এমন সময় সুধীনকাকুর মা অথবা রঙ্গলাল জেঠুর মা আস্তে আস্তে এসে দাওয়ায় বসবেন—রোজই। একটুও ক্লান্ত না হয়ে একই প্রশ্ন করবেন—আজ কি রাঁধলেন দিদি। আর ঠাকুমাও একটুও বিরক্তি বোধ না করে রোজ খুঁটিনাটি-শুদ্ধু বলবেন যে আজ কি রাঁধলেন। সেই দুই ঠাকুমারা থুত্‌নিতে হাত দিয়ে বলবেন, কি দাদু? আছ কেমন? তোমার কোলকাতা ভাল, না, আমাদের রংপুর ভাল?

বুতুস ইচ্ছে করে ওঁদের খ্যাপাবার জন্যে বলবে, কোলকাতা ভাল। অমনি দুই বুড়ি হেসে উঠবেন। বলবেন, দেখেছ! কী দুষ্টু ছেলে!

বাবু হয়ে খেতে বসলেই কোথা থেকে যে পুষিগুলো এসে জুটবে

কে জানে। আর বাচ্চাও হয়। পুষিটা বেশ দেখতে। সাদা, নরম, মোলায়েম, বড় লজ্জা-মাখা চোখ। কিন্তু মাঝে মাঝেই বাঁশঝাড় থেকে কি অন্য বাড়ি থেকে একটা ধুলোমাখা বেড়াল এসে জোটে। ভারী পাজী সেটা। গায়ে চাকা-চাকা দাগ। মনে হয় খাটাশ। আর এসেই এ-ঘরের ও-ঘরের দাওয়ায় হুয়াও হুয়াও—হুঁ-হুঁ-হুঁয়াও করে বেড়ায়। হুলোর উপরে বুহুসের যত রাগ; পুষিটার ঠিক তত ভালবাসা। কী রকম করে, কী রকম করে, গায়ে ঢলে ঢলে পড়ে; এক একবার হুলোর পেটের নীচে ঢুকে পড়ে সারাদিন মিঁয়াও মিঁয়াও করে নাকি-কান্না কাঁদে। হুলোটাকে কিছুদিন দেখা যায়। তারপর আবার কোথায় চলে যায় তা সেই জানে।

তার কিছুদিন পরই, কিছুর-মধ্যে-কিছু না কোত্থেকে পুষিকে একগাদা মিঁউ-মিঁউ-করা সাদা-কালো মুঠি-ভরা পুষুমুনু সঙ্গে নিয়ে, হয় কোন ছেঁড়া ঝুড়ির মধ্যে, নয় ঢেঁকি-ঘরের কোণায়, নয়তো বাইরের ঘরের দাওয়ার একধারে আবিষ্কার করতে হয়।

একদিন বুহুস দাওয়ায় বাবু হয়ে বসে খাচ্ছে আর একটি কালো পুষুমুনু নরম নরম তুলতুলে পা নিয়ে তড়াক্ করে লাফিয়ে থালায় পড়ল। ঠাকুমা সেদিন সুজির খিচুড়ি রেঁধেছিলেন। সুজির খিচুড়ি বড় ভালবাসে বুহুস। অমৃত'র মত একটু একটু করে খাচ্ছিল আর ঠিক অমনি সময়ে এই অপকর্ম। মাথার কি ঠিক থাকে? হাতের কাছে মেলায়-কেনা ছোট বাঁশের লাঠি ছিল—তাই দিয়ে সটান ঢিকুটাঁই করে তার মাথার উপর মারতেই, থালার মধ্যেই সে উল্টে পড়ল। চোখ উল্টে গেল। মা, কাকিমা সব দৌড়ে এলেন। ঠাকুমার খাওয়া হল না। সকলে মিলে পড়লেন রাণীকে নিয়ে চিকিৎসায়।

বহুরকম চিকিৎসাপত্র হল। আর সমস্ত সময় বুহুস অপরাধীর মত বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কেউ বুহুসের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলল না। বুহুস বাড়িতে কোনদিন এতখানি অনাদৃত হয়নি।

বিকেল থেকে পুষুমুনু মিঁউ মিঁউ করে ডাকতে লাগল। বুহুসের

মনে একটু ভরসা হল। তাহলে বোধহয় এ যাত্রা পুষুমুনু ভাল হয়ে যাবে। পুষিটা এ-দাওয়ায় ও-দাওয়ায় ঘুরে ঘুরে মিঁউ মিঁউ করে ডাকতে লাগল আর মাঝে মাঝে বুদ্বুসের চোখের দিকে সোজা চাইতে লাগল। বুদ্বুস অপরাধীর মত মুখ নীচু করে রইল, চাইতে পারল না ওর চোখে।

পুষুমুনুকে মকরধ্বজ খাওয়ানো হল, গরম দুধ খাওয়ানো হল, তারপর বিকেলের দিকে তুলোর মধ্যে করে তাকে গয়নার বাক্সে করে নিয়ে মা ও কাকীমা এক সঙ্গে শুলেন। বুদ্বুস খেল কি খেল না সে খোঁজও কেউ করলেন না সেদিন। রাতে শুয়ে শুয়ে বুদ্বুসের কানে পুষুমুনুর কান্না পৌঁছতে লাগল, মিঁয়াও মিঁয়াও। বুদ্বুসের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল, ওর ইচ্ছে করতে লাগল দৌড়ে গিয়ে ছোট্ট পুষুমুনুর সামনের পা দুটি ধরে ক্ষমা চায়—ওকে চুমু খায়—ওর সমস্ত ব্যথা নিজে কোনরকমে নিয়ে নেয়।

সেদিন ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা, তখনো কেউ ওর সঙ্গে কথা বলছেন না। আস্তে আস্তে কুয়োতলায় গেল বুদ্বুস। সেখানে কাকীমা কি যেন করছিলেন। বুদ্বুস কাকীমাকে শুধোল, কাকীমা, পুষুমুনুর কান্না শুনতে পাচ্ছি না কেন?

কাকীমা বুদ্বুসকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, পুষুমুনু পালিয়ে গেছে।

—কোথায়?

—উপরে। ঐ আকাশে। পুষুমুনু আর ফিরে আসবে না। তুমি ভগবানকে ডাক। ভগবান তোমাকে দোষ দেবেন না। ভগবান কাউকে দোষ দেন না। ভগবান সকলকে ক্ষমা করে দেন।

বুদ্বুস কিছুই বলতে পারল না। তার দুচোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। ও চুপ করে বাইরের ঘরের বারান্দায় বেঞ্চিতে বসে ফুল-বাগানের দিকে চেয়ে রইল।

ভগবানের কথায় ওর পুঁটুর দিদি শিউলিদির কথা মনে হল। শিউলিদি একদিন বিকেলে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইছিলেন—

"ওদের কথায় ধাঁধা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, এই তো সবই সোজাসুজি।"—
বুতুস জিগ্যেস করেছিল, তোমার কথা মানে কার কথা শিউলিদি?

ভগবানের কথা। শিউলিদি বলে ছিলেন।

যাঃ, ভগবান আবার কথা বলে না কি? ভগবান তো ত্রিশূল হাতে বাঘের উপরে দাঁড়িয়ে থাকেন। ভগবান তো মা দুর্গা।

তা তো বটেই রে পাগল ছেলে। কিন্তু রবি ঠাকুরের গান এটা।

রবি ঠাকুর কে?

রবি ঠাকুরের নাম শুনিসনি? সেই যে রে—রথযাত্রার কবিতা যার লেখা 'অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় ভেসে যায় রে দেশ'···সেই 'তাল-পাতার বাঁশী'র কবি।

বুতুস লাফিয়ে উঠল, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। জানি। ভুলে গেছিলাম।

তারপর বলল, বল না রবি ঠাকুর কি বলেন?

রবি ঠাকুর বলছেন ভগবানকে, যে অত মন্তর-টন্তর বড় বড় কথা আমি বুঝি না বাপু, এই আকাশ-বাতাস জল-বাতাস এই সবই যে তুমি এ কথাটা আমি খুব বুঝি।

বুতুস বলল, যা.! আমরা যে খেপ্‌লা জাল নিয়ে ক্যানেলের মাঠে পুঁটি মাছ ধরতে যাই, সেখানে ভগবান আছে? তুমি মিছি-মিছি বলছ।

শিউলিদি বুতুসকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ রে পাগলা। আছেন। সব জায়গায় আছেন। তুই বড় হলে বুঝতে পারবি। দেখবার চেষ্টা করিস্, দেখবি ঠিক দেখতে পাবি।

বিশ্বাস হয়নি বুতুসের।

কিন্তু এখন এই মুহূর্তে বুতুস কি করবে।

কাকীমা ওকে বলেছেন ভগবানকে ডাকতে। পুষুমুনুকে সে মেরে ফেলেছে। আর পুষুমুনু মিঁউ মিঁউ করে তার সঙ্গে খেতে আসবে না।

ডান হাতটাকে তুলে, বেঞ্চের সঙ্গে জোরে আছাড় মারল বুতুস। খুব লাগল। ব্যথায় মুখ কুঁকড়ে গেল, কিন্তু তবু মনের ব্যথাটা গেল না।

ভগবান কোথায় আছে ও জানে না, জানলে ভগবানের কাছে গিয়ে

ও পায়ে ধরে ক্ষমা চাইত। ঠাকুমা তো ভগবানের পুজো করে রোজ। তবে ঠাকুমার ঘরে কি ভগবান নেই? বুদ্ধুস আস্তে আস্তে চুপি চুপি ঠাকুমার ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকল। আধো-অন্ধকার। একটি পিতলের প্রদীপ জ্বলছে। কাঠের ছোট সিংহাসনের উপরে একটি রাধাকৃষ্ণের পিতলের মূর্তি। সিংহাসনের উপরে একটি মা দুর্গার পট। সিঁদুরে সিঁদুরে লাল হয়ে রয়েছে। সমস্ত ঘর থেকে ফুল-বেলপাতা-ধূপ-ধুনোর গন্ধ বেরোচ্ছে। মাথার মধ্যেটা কেমন ঝিম ঝিম করে—ভগবানের গায়ের গন্ধও পাওয়া যায়, কিন্তু কৈ? ভগবানকে তো দেখা গেল না।

বুদ্ধুস ফিস ফিস করে ডাকল, ভগবান—ভগবান!

কেউ সাড়া দিল না।

বুদ্ধুসের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে বেরোতেই দেখল অছিমুদ্দি কলু উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। সর্ষের তেল নিয়ে এসেছে সে।

ঠাকুমা কোথায় আছে জানে না। মা ও কাকীমা দুজনেই যে রান্নাঘরে আছে তা গলার স্বর শুনে বুঝতে পারল। মা বললেন, একটু দাঁড়াও অছি; আসছি।

এই ফাঁকে, বুদ্ধুস তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল—অছিদা, ভগবানকে এক্ষুনি কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো? অছিমুদ্দি এমন প্রশ্ন জীবনে শোনেনি, সুতরাং ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বলল, গেলেই দেখা পাবে কিনা জানি না, তবে তেনাদের থাকার কথা তো জায়গা মতই।

বুদ্ধুসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, কোথায়?

ক্যান্, মন্দিরে? হরিসভাক্ যাও না ক্যানে? তুমি হিন্দু, তোমার ভগবান হরিসভাক্ আছে, মন্দিরে আছে, আর আমি মোছলমান, আমার খুদা মসজিদে।

বুদ্ধুস বলল, আর পুষুমুন্নুর ভগবানকে কোথায় পাব?

অছিমুদ্দি বলল, সে ডা আবার কে ডা?

বিড়াল; মানে বিড়ালের বাচ্চা।

তার আবার ভগবান কিসের? মানুষের ভগবানই মেলে না তার আবার কুকুর-বিড়ালের ভগবান।

এবার আর সময় নষ্ট করল না বুতুস—একদৌড়ে পেছনের দরজা দিয়ে সোজা ছুটে গেল চালতাতলার মোড় পেরিয়ে কুলতলী দিয়ে সোজা ক্যানেলের পাশের মাঠে।

হু-হু করছে হাওয়া—ধানক্ষেতে ঢেউ উঠছে। ক্যানেলের জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। ঝক্‌ঝক্‌ করছে রোদ্দুর—নীল, ঘন নীল আকাশ। দুটি সোনালি চিল অনেক উপরে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ঘাসের মধ্যে চুপ করে বসল বুতুস। পুষুমুনুর এবং তার ভগবান এখানে আছে কিনা জানে না ও, তবে ওর ভাল লাগছে এখানে এসে। স্বস্তি লাগছে। ভেটকি মাছে কোন ছোট মাছকে তাড়া করেছে—জলের উপর তিড়িক-তিড়িক করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে মাছটি। একটি শামুক আর কতগুলি কেঁচো আস্তে-আস্তে ক্যানেলের পাড়ে নড়া-চড়া করে বেড়াচ্ছে। কোনরকম তাড়া নেই ওদের। একটি কাঁচপোকা বারবার উড়ে এসে ওর পাশের লম্বা লম্বা ঘাসে বসছে। তিনটি আমলকিগাছে অনেক ছায়া হয়েছে। ঝিরঝির করে পাতা উড়ছে হাওয়ায়। হাওয়া যেন ওদের চুলে বিলি কাটছে। কলকাতায় থাকতে কখনো আমলকিগাছ দেখেনি বুতুস, রংপুরে এসে প্রথম দেখল। মা ওকে একটি কবিতা শিখিয়েছেন—

'আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরুদুরু
পেয়েছে খবর পাতা-খসানোর সময় হয়েছে শুরু।'

আমলকিগাছগুলো সব সময়ই যেন দুরুদুরু করে কাঁপছে—সে শরৎ আসুক চাই না-ই আসুক।

একেবারে চুপটি করে বসে বসে বুতুস ধানক্ষেতে হাওয়া-বওয়ার শব্দ শুনল, ক্যানেলের মাছের বুড়বুড়ি কাটা দেখল—তারপর একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে বলতে গেল ভ-গ-বান। কিন্তু বলতে পারল না, জোর দমকা হাওয়া এসে কথাগুলি ওর মুখ থেকে কেড়ে নিল। উড়িয়ে দিল।

এবং পরমুহূর্তেই বুড়ুস শুনল, মিঁউ!

বুড়ুস ভীষণ ভয় পেল। চমকে উঠে ভয় পেয়ে দাঁড়াল। পিছনে তাকিয়ে দেখে পুষিটা, সব ক'টি পুষুমুনুকে ছেড়ে এসে একা-একা আমলকিগাছের গোড়ায় বসে আছে।

মুহূর্তের মধ্যে বুড়ুসের মাথায় খেলে গেল, তবে ভগবান হয়তো এইখানেই আছে, তা নইলে পুষি আসবে কেন? এই সময়ে বাড়ি থেকে এত দূরে পুষির কি কাজ পড়েছে আসবার?

বুড়ুস পুষিকে ডাকল। পুষি রাগ করল না, আঁচড়াল না, কামড়াল না, আস্তে আস্তে বুড়ুসের কাছে এগিয়ে এল। বুড়ুস পুষিকে কোলে তুলে নিল। পুষি অভিমানে বুড়ুসের বুকে মুখ ঘসে অস্ফুটে বলল, মিঁয়াও।

সে দিনটার কথা মাঝে মাঝেই মনে পড়ে বটে বুড়ুসের। সে দিনটার কথা বরাবর সে মনে করে রাখবে।

এদিকে প্রায় ভুলতেই বসেছিল। চারটে বোধহয় বাজে। নইলে না-ই বাজল—একটু আগেই না হয় গেল নর্মাল স্কুলের মাঠে। ফুটবল ম্যাচ আরম্ভই হয়ে গেল বোধহয়।

মানসিং ফুলমণির ঘরে যাবার আগেই বুড়ুস বেরিয়ে পড়ল।

গোলাপবাগানের পাশে বাতাবীলেবুর গাছ। ডালে ডালে লেবু এসেছে। গোল গোল। শিউলিদির বুকের মত সুডৌল টনটনে লেবু ধরেছে গাছে গাছে। আর একটু বড় হলে দু-একটা পেড়ে নিয়ে সামনের মাঠে ফুটবল খেলা যাবে। পায়ে বড় লাগে। বেশ শক্ত হয় লেবুগুলো।

পুঁটুটা ভারী পাজী। ওর জন্যে আজ বুড়ুসের মা-র কাছে বকুনি খেতে হল। কোত্থেকে পুঁটু এসব কবিতা শেখে, জানে না বুড়ুস। কিন্তু বুড়ুসকে শেখায়, বুড়ুস বাড়ি এসে মা-কাকীমাকে বলে।

আজকে অমনি একটি কবিতা কাকীমাকে শুনিয়ে মা-র কাছে দুপুরে কী বকুনিটাই খেল বুড়ুস। অবশ্য কবিতাটি শুনতে বেশ ভাল। তবু মা যে কেন বকলেন বুড়ুস জানে না। মা বললেন, তুমি পুঁটুর সঙ্গে মিশবে না।

চলতে চলতে হাত নেড়ে নেড়ে বুহুস সুর করে করে পুঁটুর কবিতাটি বলল :

'আম খেয়ো, জাম খেয়ো, কাঁঠাল খেয়ো না,
কাঁঠাল খেলে পেট ফুলবে, ছেলে হবে না।'

ভাল না কবিতাটা ? ফাইন্।

এই কথাটাও নতুন শিখেছে বুহুস। ইতিহাসের স্যার কথায় কথায় বলেন, ফাইন্। আকাশে মেঘ করলেও ফাইন্, রোদ থাকলেও ফাইন্; ভাল পড়া পারলে তো নিশ্চয় বলবেন স্যার একবার।

বুহুস আবার বিড় বিড় করে বলল, ফাইন্। মুদীর দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু অন্যমনস্ক থাকায় বেশ জোরেই বলে ফেলেছে মনে হল।

মুদী বলল, কিসের ফাইন্ বুহুসবাবু! কে কাকে ফাইন্ করবে ?

বুহুস লজ্জা পেল। মুখ লাল হল। বলল, কিছু না। ও অন্য কথা। ইংরিজী কথা।

নাকে মুদীর দোকানের গন্ধটা লেগে রইল। কেরোসিন তেল, তামাক, ঝোলা গুড়, চাল, ডাল, শুকনো লংকা সবকিছু মিলে মিশে কেমন একটা স্পেশ্যাল গন্ধ।

হারাগাছার টিম মাঠে নেমে গেছে।

কলকাতার কালিঘাট পার্কে, দেশপ্রিয় পার্কে ফুটবল খেলা দেখেছে বুহুস। সেখানের খেলোয়াড়দের পোশাক অন্যরকম। এখানের খেলোয়াড়েরা অন্যরকম।

হারাগাছার প্লেয়ারদের সকলেই লুঙ্গি পরা। নানারঙা চেক্ চেক্ লুঙ্গি, গুটিয়ে উপরে তুলে মালকোচার মত বাঁধা। গায়ে কারো সাদা হাতকাটা গেঞ্জী, কারো হাতওয়ালা গেঞ্জী, কারো বা কিছুই নেই। একগাদা চুল ভর্তি ঘেমো বুক দেখা যাচ্ছে। সকলেই প্রায় মুসলমান চাষা। মাঝে-মধ্যে শখ হয়; শহরে ফুটবল খেলে যায়।

ধাপের টিম ভাল টিম। ফরোয়ার্ডে যারা খেলে তারা সকলে ছিপছিপে—ভাল ড্রিবল্ করতে পারে। হাফ-ব্যাকেরা লং-পাস দেয়।

গোলকীপার মারাত্মক ভাল। কলকাতার মোহনবাগান নাকি ডেকেছে তাকে। মানে, সব মিলিয়ে লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের ছেলেদের টিম।

খেলা শুরু হল। শুরু হতে-না হতেই ধাপের দল হারাগাছাকে এক গোল দিয়ে দিল। বুতুস পুঁটু সকলে লাফিয়ে উঠল। হারাগাছার দলের সমর্থকরা মনমরা হয়ে গেল। বুতুসরা হাততালি দিল।

দেখতে দেখতে পরের পনেরো মিনিটের মধ্যে আর একটি গোল। হবি তো হ, আর দু-মিনিটের মধ্যে আবার আর একটি গোল। ধাপ তিন গোলে জিতছে। এমন সময় হাফ-টাইম হল। খেলোয়াড়েরা মুখে বরফের কুচি নিয়ে লোফালুফি করে পুঁটু আর বুতুসদের দেখিয়ে দেখিয়ে খেল। তারপর আবার খেলা আরম্ভ হল।

এবং আরম্ভ হতেই এক দারুণ কাণ্ড হল। হারাগাছার যে ক্যাপ্টেন সে একটি ঘন লাল লুঙ্গি পরে ছিল। সে হঠাৎ লুঙ্গিটা প্রায় পুরো খুলে ফেলে, ভাল করে পাক দিয়ে কষে বেঁধে নিল এবং পরক্ষণেই টিমের সকলকে চেঁচিয়ে অর্ডার দিল: 'বল্ ছাড়ি, ম্যান্ ধরো বাহে।'

আর কোথায় খেলা? মাঠময় খালি ফটাফট্ শব্দ হতে লাগল। ধাপের প্লেয়াররা প্রাণভয়ে সারা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল আর হারাগাছার ষণ্ডাগুণ্ডা ষাঁড়-খেকো বাহেরা তাদের পেছনে পেছনে দৌড়তে লাগল।

বলের মনে বল লাজুকের মত মাঠের মাঝখানে পড়ে রইল।

ধাপের দু'তিনজন প্লেয়ার পায়ে হাত দিয়ে-দিয়ে বসে পড়ল এবং মাঠে গড়াগড়ি খেতে লাগল বাবা গো, মা গো, মরলাম গো বলে। ভদ্রলোকের ছেলেরা খেলতে জানে, মারামারি করতে জানে না। ওয়ার্থ্‌লেস্।

পুঁটু বলল, বুতুস পালা, এক্ষুনি ক্যাপ্টেন হয়তো বলবে, ম্যান্ ছাড়ি ছোঁড়াগুলান্ ধরো বাহে।

যেই বলা, সেই কাজ।

বুতুস আর পুঁটু দুজনে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে পৌঁছাল।

দৌড়তে দৌড়তে পুঁটু তার বেসুরো গলায় তেড়ে গান গাইতে লাগল।

'সা রে গা মা পা ধা নি
বম্ ফেলেছে জাপানি
বমের মধ্যে কেউটে সাপ
ব্রিটিশ বলে বাপ্‌রে বাপ্...'

বাড়ি ফিরে দেখল কাকীমা বারান্দায় হারমোনিয়ম নিয়ে গান গাইছেন। একটি নীল বেনারসী শাড়ি পরে চুল-টুল বেঁধে পাউডার-টাউডার মেখে আসনপিঁড়ি হয়ে কাকীমা গালচের উপর বসেছেন। এবং তার সামনে রাঙাপিসী এবং পাড়ার অন্যান্য বড় মেয়েরা বসে আছে। চোখ দিয়ে কান দিয়ে গোগ্রাসে গান গিলছে।

ওরা দুজনে দাওয়ায় পা-ঝুলিয়ে বসে পড়ল।

কাকীমা গাইছেন, 'ওরে নীল যমুনার জল, কোন্‌খানে তুই গিয়েছিলি, তোরে কোথায় পাব বল ?' ইত্যাদি একটি গান।

বুতুস জানে না এই গান গাইলেই কাকীমা নীল শাড়ি পরেন কেন! এ-ছাড়া কাকীমা আরো কয়েকটি গান গাইতেন, 'কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী কে বাজায়' এবং 'মুক্তি' সিনেমার গান গাইতেন কাকীমা।

মুক্তি সিনেমা জিনিসটা কি তা বুতুস জানে না। তবে সকলের মুখে শুনত যে শহরের সিনেমা হলে নাকি 'মুক্তি' নামে কোন কিছু হচ্ছে।

পুঁটু বলত, প্রমথেশ বড়ুয়ার বই। আমি দেখেছি। কানন দেবীর সে কি গান। বড়ুয়ার কি অ্যাক্টিং।

তারপর চোখ নাচিয়ে বলত—যা না, দেখে আয় একদিন।

বুতুস বলত—ছোটরা সিনেমা দেখে না। ছোটদের সিনেমা এলে, মা বলেছে নিয়ে যাবে।

পুঁটু সাবান-গোলা জলে পাটকাঠি দিয়ে ফুঁ দেওয়ার মত তাচ্ছিল্যে বলত, 'ফুঃ!' বুহুসের চোখের চারপাশে অবজ্ঞার ও অজ্ঞানতার রঙ-বেরঙের বুদ্বুদ হাওয়ায় ভেসে বেড়াত। পুঁটু যে ওর চেয়ে সব বিষয়ে বেশী জানে, এ বিষয়ে বুহুস মনে মনে কোন সন্দেহ পোষণ করে না। এটি একটি পরীক্ষিত সত্য হয়ে গেছে।

অ্যাক্টিং কাকে বলে বুহুস তাও জানত না। সেদিন পুঁটুই তো শেখালো। চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে হরিসভার মাঠে যাত্রা হচ্ছিল। এর আগে বুহুস বিশেষ যাত্রা দেখে নি। কলকাতার বাড়ির পিছনের মাঠে মাঝে মাঝে গোয়ালাদের গান-বাজনা হতে শুনেছে। তা ছাড়া বিশেষ যাত্রা-থিয়েটার দেখে নি এর আগে। গোয়ালারা ভোজপুরী ভাষায় মাথায় বিছানার চাদরের পাগড়ি বেঁধে একটি ছিপ্ছিপে ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে, কারবাইডের আলো জ্বেলে, ঢোল নিয়ে জোর গান গাইতে দেখেছে।

মেয়েটি কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে গান গাইত—

'প্রীত ভইল্ মধুবনোঁয়া রামা ; তোরা মোরা'

সঙ্গে সঙ্গে মাথার পাগড়ি দুলিয়ে গাঁক্ গাঁক্ করে ওরা সকলে একসঙ্গে চিৎকার করত : 'প্রীত ভইল্ মধুবনোঁয়া রামা ; তোরা মোরা।'

সঙ্গে ঢোল আর খঞ্জনি বাজত—ঝাঁচামাচা-ঝাঁচামাচা-ঝাঁচামাচা।

কিন্তু এখানের যাত্রা অন্যরকম। বাংলা যাত্রা।

খোলা হরিসভার মাঠে ত্রিপল টাঙিয়ে হল। কী পোশাক! যারা অ্যাক্টিং করল তাদের। কী রাজবংশীভাষা। একজন বিচিত্র পোশাক পরে তার কোমর থেকে থিয়েটারী পিস্তল বের করে হাত উঁচিয়ে অন্যকে বলল, এ্যাই ত্যাখ্ মোর পিস্তল চকোচকো করিতেছে ; তব বুকে ড্যাম্ বসায়া।

মা-কাকীমারা যেদিকে বসেছিলেন, সেখান থেকে চাপা-হাসির রোল ভেসে এল। কি হল বুহুস বুঝল না। পিস্তল তো ঘোড়া টিপে ছুঁড়তে হয়। পিস্তল, সে যতই চক্চকে হোক না কেন, ছোরার মত বুকে বসালে তো শত্রু মরবে না।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? যে অ্যাক্টিং করছে সে অত কথা মানবে কেন—সে ঘুরে-ফিরে স্টেজময় হাত উঁচু করে বলেই বেড়াতে লাগল, 'দ্যাখ্ মোর পিস্তল চকোচকো করিতেছে, ড্যাম্ বসায়া।'

ড্যাম বসায়া মানে বসিয়ে দেব।

পুঁটু ভুরু নাচিয়ে বলল, কী অ্যাক্টিং দেখলি?

কাকীমাকে ভারি ভাল লাগে বুড়ুসের। কিন্তু বড়কাকু বড় গম্ভীর। বড়কাকুর শোবার ঘরে, খাটের পাশেই একটি হকি-স্টিক আছে। রাতে চোরের জন্যে ও দিনে বুড়ুসের জন্যে। ও দিয়ে যে বুড়ুসকে মারা হয় তা নয়। কিন্তু বুড়ুস বড়কাকুর ঘরের দরজা পেরুলেই, হকি-স্টিকের যে অংশ দিয়ে বল মারা হয় সেই অর্ধ-চন্দ্রাকার জিনিসটি বড়কাকু বুড়ুসের গলায় লাগিয়ে একটা হ্যাঁচ্কা টানে তাঁর কাছে বুড়ুসকে আকর্ষণ করেন। গলায় বড় লাগে।

তবে যখন ভাল মুডে থাকেন বড়কাকু, তখন দারুণ লাগে বুড়ুসের। এখান থেকে ওখানে গান গেয়ে বেড়ান। সে বড় মজার গান। কাকীমার গানের মত সুরেলা গান নয়। কে যেন কবে ক্যারিকেচার করেছিলেন, তার গান।

বেসুরে, বেতালে, হাত নেড়ে নেড়ে বড়কাকু গাইতেন—নাচার ভঙ্গীতে উঠোন থেকে দাওয়ায়, দাওয়া থেকে উঠোন করতেন, গাইতেন, "অস্তি গোদা……"

কোথায় ছিল? কে আনিল? অস্তি গোদা।
বিশাল শাল্মলী তরু, অস্তি গোদা।
আহা, কোথায় ছিল? কে আনিল? অস্তি গোদা।
গোদা রে, ও আমার…গোদা রে…।

এই রকম করে গান চলত প্রায় আধঘণ্টা ধরে।

বুড়ুস চুপ করে গান শুনত। মুখে হাসত না। চোখ দিয়ে খুব হাসত। আসলে একটি সংস্কৃত লাইন—সেটিকেই ভেঙে ভেঙে বিকৃত করে গাওয়াতে এই অদ্ভুত রসের সৃষ্টি হত। লাইনটি হল—'অস্তি

গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু……

বুহুসের মা মোটে গান গাইতেন না। কিন্তু মা-র গলা খুব ভাল ছিল। গলার মধ্যে বড় একটি শান্ত স্নিগ্ধ ভাব ছিল। মা-র গান শুনলে মনটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগত—খেলার মাঠে খুব ফুটবল খেলে, গাছের নীচে এসে বসলে মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া যেমন লাগে।

যদি কোনদিন জ্যোৎস্না উঠত, ঝির্-ঝির্ করে হাওয়া বইত, হাসনুহানার ঝাড়ে ঝাড়ে অজস্র ফুল ফুটত, গোলাপজাম গাছ থেকে গোলাপজামের সুগন্ধি কেশর হাওয়ায় উড়ত, তেমন কোন সন্ধ্যেবেলায় পাড়ার মেয়েদের অনেক পীড়াপীড়িতে মা হয়তো গাইতেন। রবিঠাকুরের কোন গান। শিউলিদি বলত, ব্রাহ্মসঙ্গীত না কি ব্রহ্মসঙ্গীত কি জানি। শিউলিদি মা-র কাছে খুব আসত, মাকে খুব ভালবাসত। সেইসব সন্ধ্যায় বুহুসের খুব ভাল লাগত। শিউলিদির গায়ের রঙ কালো ছিল—কিন্তু চোখ-মুখ খুব সুন্দর ছিল। সব মিলিয়ে পুঁটুর দিদি বলে মনেই হত না। পুঁটুটা কেমন যেন সবজান্তা সবজান্তা। আর শিউলিদি যেন অনেক কিছু জানবার জন্যে, শোনবার জন্যে সব সময় আকুল হয়ে আছে।

শিউলিদি কাছে এলেই বুহুসের ভাল লাগত।



একলা দুপুরগুলো ভারি ভাল লাগে বুহুসের। প্রতিটি দুপুর যেন তার সাম্রাজ্য। সে যেন প্রতিটি দুপুরে দুখের দুয়ার দিয়ে অন্য কোন স্বপ্ন-রাজ্যে প্রবেশ করত। সে রাজ্যে বুহুস ছাড়া আর কারো কোন প্রবেশাধিকার ছিল না।

মা বলতেন বটে, বুহুস রোদে টো-টো করে না ঘুরে, ঘরে ঘুমোও।

কিন্তু বুহুস বুঝত যে, মা রাগ করতেন না বেরোলে। কারণ মা-ও তো জানতেন যে, কলকাতার মত এখানে বিপদ নেই। ট্রাম নেই, বাস নেই, ছেলেধরা নেই, গুণ্ডা-বদমাস নেই। এখানে শুধু আকাশ, বাতাস, ভালোলাগা, এইসব আছে। এখানে ভয়ের কিছু নেই।

কলকাতার দুপুরগুলোর কথা মনে পড়ে বুহুসের। বাড়ির পেছনের ছোট্ট বাগানে করবীগাছের নীচে সারা দুপুর বসে বসে পাহাড়-নদী বানাত, তারপর বাথরুম থেকে মগে করে জল এনে সেইসব ঝর্ণা দিয়ে নদী বওয়াত। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে মাটির ঠাণ্ডা সোঁদা গন্ধ নিত নাক ভরে। হাতে কেঁচো লাগত, ব্যাঙাচি লাগত, তবু কখনো ঘেন্না করত না বুহুসের। মাটির গন্ধ বড় ভালোবাসে বুহুস। আর রংপুরের মাটি তো দেশের মাটি।

সেজকাকু বড় ভালবাসে দেশকে। শুধু রংপুর বলে নয়, বাংলাদেশ বলে নয়, ভারতবর্ষকে। নইলে স্বাধীনতার জন্যে এত সব করবে কেন? পুলিসই বা দিনরাত্তির সেজকাকুর পেছনে পেছনে ফেউয়ের মত ঘুরবে কেন? কী কলকাতায়, কী এখানে, কোথায় না পুলিস আসে?

কলকাতায় সেজকাকু এলেই কি করে যেন ওরা খবর পেত। মাঝরাত্রে কড়া নড়ে উঠত দরজার। বাবা উঠতেন। মা, শোবার ঘরে বুহুসদের নিয়ে মশারীর মধ্যে শুয়ে থাকতেন। টুপি পরা-পরা পুলিসরা ঘরে ঢুকত। মশারী তুলে দেখত, খাটের তলা দেখত, বাথরুম দেখত, তন্ন তন্ন করে খুঁজত। কিন্তু সেজকাকুকে পেত না। সেজকাকু রোজ রাত্রে মেজমামার অফিসে গিয়ে শুয়ে থাকত। আর কেউ জানত না।

সেজকাকু হাজারিবাগ জেলার অভ্রখনি ঘুরে ঘুরে ডিনামাইট যোগাড় করে আনতেন। চুরুটের মত দেখতে ডিনামাইটগুলো। বাক্স ভর্তি-ভর্তি থাকত। সেজকাকুর কাছে কত লোক আসত। কত রকম লোক। সেজকাকু বুহুসকে বলতেন—বুহুস, তুমি এসব কথা বাইরের কাউকে বোল না কিন্তু, তাহলে আমাকে কিন্তু পুলিস মেরে

ফেলবে, জেলে রেখে দেবে সারাজীবন। বুড়ুস হাত নেড়ে নেড়ে বলত, না, না। কক্ষনো বলব না।

সেজকাকু শুয়ে শুয়ে গান গাইতেন, 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।' 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ, কেন গো মা তোর শুষ্ক বয়ান, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ?' গলা ছেড়ে গান গাইতেন সেজকাকু। বুড়ুস শুনত আর বঙ্গ আমার জননী আমার এই কথা বলে নিজে নিজেই কাঁদত।

সেজকাকু স্বদেশী করেন বলে, বাবার সরকারী চাকরি যে-কোন সময়ে যেতে পারত! কিন্তু বাবা কখনো বলেননি যে, তুই এসব করিস না। বুড়ুস সেজকাকুর কাছে বসে বসে নানারকম গল্প শুনত। সেজকাকু পালিয়ে বেড়াবার জন্যে দাড়ি-চুল সব বড় বড় করে রেখেছিলেন। উজ্জ্বল দুটি বড় বড় চোখ, পরনে সাদা মোটা খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী—তীক্ষ্ণ নাক। সব মিলিয়ে কোন সন্ন্যাসী বলে মনে হত বুড়ুসের সেজকাকুকে।

একবার মথুরাতে গিয়ে সেজকাকু এক ধর্মশালায় উঠেছেন। তাঁর পাশের ঘরেই উঠেছে এক পুলিসের টিকটিকি। যেই না বুঝতে পারা, অমনি সেজকাকু কায়দা করে পালিয়ে এলেন। সকালবেলা উঠে চান-টান করে নিজের ঘরে তালা লাগিয়ে নিজের সম্বলমাত্র একটি ঝোলা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে গেলেন। টিকটিকি ভাবল, তালা লাগিয়ে গেলেন যখন, তখন দুপুর হোক, বিকেল হোক ফিরবেন তো নিশ্চয়। ততক্ষণে সেজকাকু ট্রেনের কামরায়। লোকসানের মধ্যে একটি তালাই লোকসান হল।

নিস্তব্ধ দুপুরে ঘুরে ঘুরে বুড়ুস এসব কথাও ভাবে। এই তার দেশ, স্বদেশ, এই তার সত্যিকারের দেশ এখন। এইখানে ঠাকুর্দা মারা গেছেন, এইখানে বাবা-কাকারা পড়াশুনা, খেলাধুলো করেছেন, এই বাড়ীতে মা, কাকীমা বিয়ের পর নতুন বউ হয়ে এসে উঠেছেন। এই বাড়ি, এখানের মাটি, এখানের হাওয়া, এখানের আকাশ বড় ভালবাসে

বুহুস। কোনদিনও এই দেশের মাটির সে অমর্যাদা করবে না। অনেক টাকা রোজগার করবে, এই বাড়িতে খুব ধুমধাম করে দুর্গাপুজো করবে, যাত্রা-গান হবে—আরো অনেক অনেক কিছু করবে। সেসব ভাবনা ভাবে ও।

এখানের প্রায় সব লোকই মুসলমান। এখানের লোকেরা ভারি ভাল। কে হিন্দু কে মুসলমান তা বোঝা যায় না। কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। ভারি ভাল জায়গা এই রংপুর, বাবাকে বলবে বুহুস, কোনদিনও যেন এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও না যায়।

ঠাকুমার রান্না পায়েস, বৃষ্টি-ঝরা রাতের ঘুঙুর পায়ে টিনের চালে টাপুর-টুপুর নাচ, রঙ্গনের ডালে বুলবুলির গান, ফর্সা বিকেলে বাঁশ-ঝাড়ের আড়াল দিয়ে হিমালয়ের বরফ-ঢাকা চূড়ো দেখা, এসব বুহুস আর কোথায় পাবে? মনে মনে ও আবার সুর করে গায়, ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।

সুধীনকাকুদের পাশের বাড়িটা যেন কাদের। নাম ভুলে গেছে বুহুস। বোধহয় পূর্ণবাবুদের, ওঁরা যেন কোথাকার জমিদার। বিরাট চত্বরওয়ালা বাড়ি—চকমিলানো বাড়ি। সাদা উঁচু ছাদের কোঠাঘর। সারা দুপুর কবুতরগুলো কার্নিশে কার্নিশে কুরর্-কুর—কুরর্-কুর করে বেড়ায়। পুজোর সময় এই মাঠে মোষ-বলি হয়—ড্যাংড্যাড্যাড্যাং ড্যাং, ড্যাংড্যাড্যাড্যাং ড্যাং করে বাজনা বাজে।

এখন হরিসভার পুকুর ছবির মত শুয়ে আছে। পাশের সজনে গাছে দুটি বক ঘুমোচ্ছে। ফিনফিনে ভয়েল-শাড়িপরা ফড়িং সুন্দরীরা সারা মাঠে পিড়িং পিড়িং করে বেড়াচ্ছে। সুধীনকাকুদের বাড়ির হাতির শুঁড়ওয়ালা উঁচু সিঁড়ি। লটকা গাছ—ঝুপড়ি হয়ে আছে। লটকা খেতে খুব মজা। লিচুর মত, অথচ লিচু নয়। জলে মুখ ভরে যায়।

পুকুরপাড়ে সাদা সাদা মধুর ফুল ফুটেছে অজস্র। বুহুস শুয়ে শুয়ে মধু চুষে চুষে খায়। মৌমাছিরা কানের কাছে মিনতি করে বলে, আমাদের মধু খাচ্ছ কেন গো? আমাদের মধু খাচ্ছ কেন গো? বুহুস

একা একা হাসে। ফিসফিস করে বলে, কতটুকুই বা খেলাম, রাগ কচ্ছো কেন গো? একটু খাই-ই না গো?

নির্জন দুপুরে ছাইরঙা বাছুর, পটপট শব্দ করে হরিসভার মাঠে ঘন সবুজ ঘাস উপড়ে খায়, কান দিয়ে পত্ পত্ শব্দ করে মাছি তাড়ায়, বাছুরের গায়ের গন্ধ বুদ্বুসেব ভারী ভাল লাগে। বগারী পাখির ঝাঁক ফরর্-ভরর আওয়াজ করে সজনের ফুলের মত উড়ে যায় আর ঝরে পড়ে। গোরুর গায়ের গন্ধে ভারী হাওয়া বুদ্বুসের ভাল লাগে। কখনো কখনো বর্ষার বিকেলে কি শীতের দুপুরে হরিসভার পুকুরের বিরাট জলঢোঁড়া সাপটি প্রতিমা-ভাসান-দেওয়া কলাগাছের ভেলার উপর সাঁতরে উঠে রোদ পোহায়। বিরাট পুকুরের এককোণায় ধোপা পাটের উপর কাপড় আছড়ায়—ফটাফট্-ফটাস্। ফটাফট্-ফটাস্। পুকুরপাড়ের গাছগাছালিতে আওয়াজ ধাক্কা খেয়ে হা-হা করে বেড়ায় —ফটাফট্-ফটাস্। পাগলি বুড়ি ভিখারী শঙ্করী, শাড়ির আঁচল লুটিয়ে একা একা কদমগাছের নীচে কাঁপা কাঁপা গলায় গান গেয়ে বেড়ায়, ক্ষুদিরামের সেই গান 'একবার বিদায় দাও মা। ঘুরে আসি···'

পাগলি শঙ্করী কারো কাছে হাত পেতে কোনদিন ভিক্ষা চাইত না। সকলে নিজের থেকেই ওর দেখা-শোনা করত। তবু বুদ্বুসের মনে হত ঐ সব করুণ বিষণ্ণ শান্ত দুপুরের প্রতিভূ হয়ে শঙ্করী যেন আঁচল লুটিয়ে একা একা নীচু গলায় গান গেয়ে ফিরত। ওকে দেখলে বুদ্বুসের মন ভারী বিষণ্ণ হয়ে উঠত।

কোন কোন দুপুরে আবার ভীষণ খুশী খুশীও লাগত। গাছের ছায়ায় ঘেরা নির্জন পথে দৌড়তে দৌড়তে ওর মনে হত ও যেন পাখির মত উড়ে চলেছে। অনেকখানি পথ ওর পা পড়ত না মাটিতে— বসন্তবৌরি পাখির মত ওর হলুদ পাখা গজাত। ওর মনে হত ও ভগবান হয়ে গেছে। দৌড়ে গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে মাকে বলত, মা, মা, জানো, আমি না আজকে উড়ে গিয়েছিলাম, পাখির মত; বসন্তবৌরি পাখির মত।

ঘুম ভেঙে মা বলতেন, কি যে করিস বুদ্বুস একটু শান্তিতে শুতে

দিস না তুই। মা বিশ্বাস করতেন না, কেউ বিশ্বাস করত না। কিন্তু একমাত্র বুতুস একা জানে যে পাখির মত অনায়াসে বুতুস তখন উড়তে পারত।

কেন যে এ-কথা মা বিশ্বাস করেন না, বুতুস বুঝত না। পৃথিবীতে কত কথাই তো আছে যা বিশ্বাস করার নয়, অথচ তবু তো বুতুস বিশ্বাস করে, অন্য সকলে বিশ্বাস করে।

গোখরো সাপ নাকি রোজ রাতে এসে ফুলমণি গোরুর দুধ খেয়ে যায়। বাছুর কোন দুধ পায় না, বুতুসরা কোন দুধ পায় না—গোখরো সাপে গোরুর পা জড়িয়ে ধরে লেজ দিয়ে, তারপর নাকি গোরুর দুধের বোঁটায় মুখ লাগিয়ে চুষে চুষে দুধ খেয়ে নেয় নিঃশেষ করে। মানসিং বলে, পা জড়ায় না, এমনিই খায়। গোখরো সাপ দেখেই গোরু ভয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে, আর সেই অবকাশে সাপ দুধ খেয়ে চলে যায়।

গোয়ালঘরের মেঝেতে নাকি গর্ত দেখা গেছে। বন্দুক ছাড়া এভাবে গোখরো সাপ মারা যাবে না। এরপর বাবা যখন আসবেন কলকাতা থেকে তখন এই সাপ মারার চেষ্টা করা হবে। বাবা শীগগীরই নাকি আসবেন।

একদিন দুপুরবেলা বুতুস একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাড়ির পেছনের বাগানে। বিরাট বাগান। আনারস ক্ষেত, আম-জাম-কাঁঠাল-লিচু-জলপাইয়ের গাছ। আলুর ক্ষেত, ছোট পুকুর। চালতা গাছ, সজনে গাছ, কালোজাম গাছ, রঙ্গনের বেড়া, কাঠগোলাপের জঙ্গল।

কত পাখি, কত প্রজাপতি, কত ফড়িং, কত পোকা, কত কী—সারা দুপুর বুতুস ঘুরে ঘুরে এই অনাবিষ্কৃত জগৎকে একটু একটু করে, তেঁতুলের আচারের মত চেখে চেখে চিনত।

ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমনি সময় দেখল শিউলিদি আসছে বাগানের রাস্তা বেয়ে, এ পথে এলে বড়রাস্তায় পড়তে হয় না। সটান পুঁটুদের বাড়ি থেকে বুতুসদের বাড়ি এসে ওঠা যায়।

কিরে বুতুস? কি কচ্ছিস? একা একা?

এই। এমনি।

এমনি মানে ?

এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছি।

পাগল নাকি তুই ? এই রোদে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিস ? কেন বেড়াস রে ? এমনি করে ?

এমনিই—মজা লাগে, লাজুক-লাজুক মুখে বলল বুতুস। শিউলিদি ঝর ঝর করে হেসে উঠল। শরতের ভোরে শিউলিগাছ নাড়া দিলে যেমন করে শিউলি ফুল ঝরে, তেমনি করে। বুতুস বলল, জানো শিউলিদি, এক্ষুনি একটা সাপের খোলস দেখলাম।

কোথায় দেখলি রে ?

ঐ তো জলপাইগাছের তলায়।

শিউলিদির বিশ্বাস হল না, বাগানের বেড়ার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে বলল, কোথায় ? চল তো দেখি।

ঐ ছাখো, ঐ যে, বলে বুতুস শিউলিদিকে নিয়ে গিয়ে সাপের খোলসটা দেখাল।

সত্যি তো রে। এ শঙ্খচূড়ের খোলস। তুই কেন এরকম বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াস ? দাঁড়া, আমি বৌদিকে গিয়ে বলে দেব।

বুতুস একটু ঘাবড়ে গেল, তবু ঠোঁট উল্টে বলল, বলোই না। মা জানে না বুঝি ? মা জানে।

জলপাইগাছের ডালপালাগুলো ঝুঁকে পড়েছিল। রোদ পাতায় পাতায় পিছলে পড়ে আলোছায়ার বুটি কাটা গালচের উপর কাঁপছিলো! শিউলিদির শাড়ির রঙের সঙ্গে ছায়ার রঙ এক হয়ে গেছিল।

শিউলিদি বুতুসকে আরো কাছে ডাকল, তারপর ওর মুখটি ছ'হাতের তেলোয় নিয়ে বলল, দেখেছ, ছেলে রোদে রোদে ঘুরে মুখটা একেবারে লাল করে ফেলেছে। তারপর শাড়ির আঁচল দিয়ে বুতুসের মুখটি ভাল করে মুছিয়ে দিল শিউলিদি।

শিউলিদির চুল খোলা। কালোর মধ্যে একটি হলদে ডুরে শাড়ি পরেছে। চুল থেকে ভুর ভুর করে কি যেন কি তেলের মিষ্টি গন্ধ

বেরুচ্ছে। বুতুসকে প্রায় কোলের কাছে নিয়ে শিউলিদি বুতুসের মুখ মুছোতে মুছোতে বললেন, তুই এত সুন্দর কেন রে বুতুস?

শিউলিদির দু-উরুর সঙ্গে বুতুসের গা লেপ্টে রইল। বুতুসের ভীষণ লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল, গা শিরশির করতে লাগল।

বুতুস বলল, জানি না।

তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে সপ্রতিভ হয়ে বলল, তুমি এত সুন্দর কেন?

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল শিউলিদি।

—আমি সুন্দর? যাক, তুই তাও বললি বটে। তবু বললি তো। মনে করে রাখব। তবে যাই বলিস, তোর মত না।

বুতুস বলল, ধ্যাৎ, তা কি করে হবে? তুমি তো মেয়ে।

শিউলিদি আবার হাসল।

বলল, তুইও তো মেয়ে। ছেলেরা এত সুন্দর হয় না।

বুতুস অকাট্যভাবে জানে যে সে মেয়ে নয়। কিন্তু সে প্রমাণ তো শিউলিদিকে দেখানো যায় না। প্রয়োজন হলে বড় জোর পুঁটুকে দেখাতে পারে।

—বাড়ি চল্, আয় আমার সঙ্গে।

—না তুমি যাও। আমি এখন পুকুরের ধারে যাব।

—সেখানে কি?

—কচ্ছপের ডিম আছে।

—আসবি না আমার সঙ্গে।

—না। বুতুসের রাগ হয়েছে, শিউলিদি ওকে মেয়ে বলেছে বলে।

শিউলিদি বলল, তাহলে শোন্, আমার কাছে আয়। তোর মুখ মুছিয়ে দিলাম এত যত্ন করে, আমাকে একটা প্রাইজ দিয়ে যা।

—কি প্রাইজ? আমার কিচ্ছু নেই।

—আয়ই না। তোর কী আছে তুই জানিসই না।

বুতুস কাছে এল।

শিউলিদি ওর থুতনিতে হাত দিয়ে বলল, তুই একটা বাবুসোনা।

বলেই, শিউলিদি ওকে ঝাপটে ধরে ওর ঠোঁটে ভীষণ জোরে চুমু খেল, রীতিমত কামড়ে দিল শিউলিদি।

বুতুসের ভীষণ গরম লাগতে লাগল, শিউলিদির বুকের ভাঁজে পাউডারের গন্ধ পেল—হারের লকেটটা দুলতে দুলতে এসে বুতুসের জামার পকেটে ঢুকে গেল।

বেশ অনেকক্ষণ পর শিউলিদি ওকে ছেড়ে দিল।

বুতুস দেখল শিউলিদির চুল এলোমেলো, কান গাল সব বেগনে হয়ে গেছে—জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। বুকটা উঠছে নামছে। এরকমভাবে শিউলিদিকে বুতুস কোনদিনও দেখেনি। এতদিন শিউলিদিকে ভীষণ ভাল লাগত বুতুসের। এই মুহূর্তে কেমন হঠাৎ খারাপ লাগতে লাগল।

চুলগুলিকে কপাল থেকে সরাতে সরাতে শিউলিদি বলল, আজ ভীষণ গরম না রে বুতুস? সারা শরীর জ্বালা-জ্বালা করছে। তোর করছে না?

বুতুস বলল, আমার তো সব সময়ই করে।

শিউলিদি অবাক হয়ে চেয়ে রইল বুতুসের দিকে।

বলল, সব সময় করে?

বুতুস বলল, হ্যাঁ।

—যাই বলিস আজ অস্বাভাবিক গরম, না? আজ বোধহয় বিকেলে বৃষ্টি হবে।

বুতুস মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়ল।

শিউলিদি বুতুসদের বাড়ী না ঢুকে উল্টোদিকের পথে ফিরে যেতে লাগল।

বুতুসের অবাক লাগতে লাগল। তাহলে এলই বা কেন? গেলই বা কেন? একটু গিয়ে শিউলিদি হাতছানি দিয়ে বুতুসকে আবার ডাকল।

ইচ্ছে না থাকলেও বুতুস গেল।

শিউলিদি বলল, রাগ করেছিস বুতুস? তোকে আদর করলাম বলে।

বুতুস গোমড়া মুখে বলল, আমার ঠোঁট জ্বালা করছে। তুমি কি গোখরো সাপ ? এমন করে চুষেছ না! এমন করে কেউ আদর করে ?

শিউলিদি চারপাশে চেয়ে নিয়ে বলল, এই পাগলা, পাগলামি করে না বাবু। তোর কাছে প্রাইজ চাইলাম, তুই বললি, তোর কিচ্ছু নেই। তাই তো একটু মজা করলাম।

তারপর একটু থেমে বলল, শোন্ বুতুস, এরকম করলে কিন্তু আমি বৌদিকে বলে দেব যে, তুই সাপের খোলস আর কচ্ছপের ডিমের পিছনে সারা দুপুর ঘুরে বেড়াস।

বুতুস বলল, দিও না বলে। আমিও মাকে বলে দেব, তুমি আমার ঠোঁট কামড়ে আদর করেছ। আমার লেগেছে।

শিউলিদি যেন কি ভাবল। তারপর বলল, বাঃ বাঃ, তুই দেখি খুব দুষ্টু হয়েছিস। লোকে আদর পায় না, তোকে একটু আদর করলাম, আর তুই আমার উপর রেগে টং হয়ে আছিস। আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। আমিও বৌদিকে বলব না, তুইও বলবি না। ঠিক আছে ?

বুতুস বলল, ঠিক আছে।

শিউলিদি আবার বলল, ঠিক তো রে বুতুস ? কিছু বলবি না তো ?

বলছি তো ঠিক।

বুতুসের কেন জানি মনে হল যে, শিউলিদিও ওর মত ভয় পেয়েছে। পাছে মা জানতে পায়।

তারপর কি ভেবে শিউলিদি বলল, এতদূর এলাম, বৌদির সঙ্গে দেখা করেই যাই ; কি বলিস ?

বুতুস বলল, যাও না। মা তো জেগেই আছেন। আজ মা বই পড়ছেন।

শিউলিদি বলল, আচ্ছা, তাই যাই। তুই ভীষণ ভাল ছেলে রে বুতুস। তোর মত একটা ছেলেই হয় না।

শিউলিদি বোধহয় ঠিকই বলেছিল। সেদিন বোধহয় অস্বাভাবিক ছিল। সেদিন বিকেলে সত্যি সত্যিই আকাশে মেঘ করে এল। জোরে জোরে হাওয়া বইতে লাগল, সিঁদুরে আমের গাছ থেকে টুপটুপিয়ে

আম ঝরে পড়তে লাগল। চন্দনা পাখির ঝাঁক চ্যাঁ চ্যাঁ করে জঙ্গলের দিকে উড়ে যেতে লাগল।

বুতুস বড়ঘরের সিঁড়িতে বসে কখন বৃষ্টি নামে তার অপেক্ষা করতে লাগল। বৃষ্টিতে ভিজলে সাপের খোলসটা কেমন হয়ে যাবে কে জানে? কচ্ছপের ডিমগুলো হয়তো সব জলের তোড়ে ভেসে যাবে। কাল হয়তো গিয়ে আর খুঁজে পাবে না। বৃষ্টি নামলেই কই, খল্‌সে, পুঁটি, মাগুর, শিঙি, সব লাফালাফি করতে আরম্ভ করবে। চতুর্দিক থেকে সোঁদা মাটির গন্ধ উঠবে। বাতাবীলেবুর আর অন্যান্য লেবুর গন্ধ ভাসবে হাওয়ায়। তিস্তা আর ঘোঘট নদীর মধ্যে যে ক্যানেল, সেই ক্যানেলে কল্‌কলিয়ে জল ছুটবে।

আসুক; আজ বৃষ্টি আসুক। আজকে প্রাণভরে বৃষ্টিকে কামনা করছে বুতুস। আজকে শিলাবৃষ্টি হোক। উঠোনে শিল কুড়োবে ও।

কাকীমা পাশে মোড়ায় বসে চুল বাঁধছিলেন, হঠাৎ বললেন, বুতুস তোর ঠোঁটে কি হয়েছে রে? অমন লাল হয়ে ঠোঁটটা ফুলেছে কেন? কিছু কামড়েছে বুঝি?

বুতুসের বুকটা ধক্ করে উঠল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, ঠিক তখন কয়েক ফোঁটা চটপটে বৃষ্টি উঠোনে এবং টিনের ছাদে চিড়বিড় করে পড়ল।

ফস্ করে বলে ফেলল বুতুস, কাঠপিঁপড়ে কামড়েছে কাকীমা।

কাকীমা কাছে ডেকে বললেন, দেখি দেখি। ঈস্! কিছু লাগাসও নি?

বুতুস বলল, কি লাগাব?

গরম জলে একটু পটাস পারমাংগানেট গুলে মুখটা ধুয়ে ফেল কুলকুচি করে। দাঁড়া, আমি করে দিচ্ছি চুল বেঁধে নিয়ে।

ততক্ষণে বৃষ্টি নেমে গেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সুপুরী-গাছের মাথা পাগলের মত এদিক-ওদিক হচ্ছে, মাটিতে হাঁড়িতে পুঁতে রাখা মজা-সুপুরীর উৎকট গন্ধ বেরুচ্ছে। ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্ করে টিনের ছাদে বৃষ্টি নেচে চলেছে।

বুতুস জীবনে আর কখনো মিথ্যে কথা বলেনি আগে। সেই প্রথম মিথ্যে কথা। নিজেকে খুব অপরাধী লাগছিল। ভীষণ রাগ হচ্ছিল শিউলিদির ওপর। বুতুসের দোষ কিছুই নেই। বুতুসের নাকে শিউলিদির বুকের পাউডারের গন্ধটা এখনো লেগে আছে। ভাবলেই যেন কি রকম গাটা শিউরে শিউরে ওঠে। ভাল লাগে না; আবার ভাল লাগেও। কিন্তু ঠোঁটটা বড় জ্বালা করছে।

ঈস্! শিউলিদির জন্যে, তার কাছে প্রতিজ্ঞা রাখার জন্যে, বুতুসের আজ মিথ্যে কথা বলতে হল? ভগবান নিশ্চয়ই ওকে পাপ দেবেন। কালই বুতুস ক্যানেলের ধারে আমলকী গাছেদের নীচে গিয়ে ভগবানকে শুধোবে, ভগবান সত্যি সত্যি পাপ দেবেন কি না।

বুতুস ঠিক করেছে শিউলিদির কাছে আর যাবে না। শিউলিদিটা ভারী অসভ্য।

এমন কাণ্ড হতে পারে কে-ই বা ভেবেছিল?

সামান্য একটি চড়ে যে এতবড় কাণ্ড ঘটতে পারে তা কে জানত।

দোষও বুতুস কিছু করেনি। হরিসভার মাঠে যতি, নির্মল ওরা সকলে খেলা করছিল, পুঁটুও ছিল। খেলতে খেলতে কি খেয়াল হল, পুঁটু বলল বিক্রমাদিত্য বিক্রমাদিত্য খেলবি? বলেই সে দৌড়ে গিয়ে ধোপার পাটের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসল। বলল, এই আমার রাজ-সিংহাসন—এখন প্রজাগণ তোমরা তোমাদের অভিযোগ পেশ কর।

বুতুসকে পুঁটু বলল অভিযোগ পেশ করতে।

পুঁটুর সামনে দাঁড়িয়ে বুতুস ভাবতে লাগল কি অভিযোগ করা যায়।

ভাবল, শিউলিদির কথাটাই বলে ফেলে। ঠিক সেই সময় নির্মল আর যতি হঠাৎ পুঁটুকে ধাক্কা দিয়ে ঝপাং করে পুকুরে ফেলে দিল।

পুকুরের নীচে অনেক ভাঙা শিশি-বোতল কাদায় পড়েছিল—মানে গেঁথেছিল। একটি ভাঙা বোতল ভেঙে অনেকখানি ঢুকে গেল।

রক্ত, কি রক্ত। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত।

পুঁটুকে শেষে হাসপাতাল অবধি নিয়ে যেতে হল।

এই অপকর্মের জন্যে বুহুসকেও দায়ী করা হল এবং কোনরকম বিচার-বিভাগীয় তদন্তের আগেই বড়কাকু তাকে বাড়িতে ডেকে এমন একটি চড় মারলেন রগের ওপর যে তার মনে হল সমস্ত পৃথিবী-গাছপালা সব পা-উপরে তুলে বাঁই বাঁই করে ঘুরছে।

সে রাতেই বুহুসের জ্বর হল। ভীষণ জ্বর। জ্বর কিছুতেই কমল না। দুদিন হল, তিনদিন হল, তবু জ্বর কমল না।

বড় বড় কচুপাতা মাথার নীচে দিয়ে মাথায় অনেক জল ঢালা হল, তবুও জ্বর কিছুতেই কমল না।

শহর থেকে ভূপতিকাকা—লোকে বলত ভূপতি ডাক্তার—ঘোড়ার গাড়ি চেপে দু দুবার এলেন। অনেক তেতো ওষুধ খেল বুহুস, গেলাস গেলাস বার্লি খেল। কুঁইয়া কা-পানি কাগজী লেবুর রস দিয়ে। তবু জ্বর ছাড়ল না।

বড়কাকু কেবল এ বারান্দা ও বারান্দা করে বেড়াতে লাগলেন। বুহুস মাথার যন্ত্রণায় চাইতে পারল না ভাল করে, কিন্তু মনে হল পুষুমুনুর মাথায় লাঠির বাড়ি মেরে সে যেমন শাস্তি পেয়েছিল, বড়কাকু ঠিক সে রকম শাস্তি পাচ্ছেন এখন।

চিন্তায়, অনুশোচনায়, বড়কাকুর চান-খাওয়া বন্ধ হল।

চারদিনের দিন সকালে কাকীমা বুহুসের মাথাটি কোলে নিয়ে বসে আছেন। জলের সঙ্গে অডিকোলন মিশিয়ে কপালে একটু করে ন্যাকড়া ভিজিয়ে দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে বুহুসের কপালের কাছে মুখ এনে বলছেন, কি রে বুহুস? এ রকম হলি কেন? কবে ভাল হবি রে?

আজ নিয়ে চার দিন হল জ্বর। বুহুস কিছু ভাবতে পারে না। ওর মাথার ভিতরে বড় যন্ত্রণা। মাথা তুলতে পারে না। মাথার মধ্যে অনেকগুলো দাঁড়কাক সব সময় ডাকে, কা-খ্যা, কা-খ্যা।

এমন সময় শিউলিদি এল।

বুতুস ভাবল, শিউলিদির মুখে হয়তো কোন বিষ ছিল, সেদিন শিউলিদি ওর ঠোঁট চুষেছিল বলে হয়তো এমনি অসুখ হল।

কাকীমা বলল, শিউলি, তুই একটু ওকে নিয়ে বোস, আমি একটু বাথরুম থেকে আসি।

বুতুসের ইচ্ছা হল বলে, না না, শিউলিদিকে চাই না, শিউলিদিকে তাড়িয়ে দাও।

কিন্তু কথা বলতে পারল না বুতুস।

শিউলিদি এসে, কাকীমা ঠিক যেমনি করে বসেছিলেন, কোলে বুতুসের মাথা নিয়ে তেমনি করে বসল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তারপর, একটু বাদে ফিস ফিস করে বলল, যেন কোন খারাপ কথা বলছে, বাবুসোনা, তোমার খুব কষ্ট?

বুতুস মাথা নাড়ল একটু। তাতে মাথা ব্যথা বেড়ে গেল।

শিউলিদি বলল, পুঁটু ভাল আছে। পুঁটু বলেছে যে তোমার কোন দোষ নেই। নির্মল আর যতিই ওকে ফেলে দিয়েছিল। সবাই জানে যে তুমি খুব ভাল ছেলে। বুঝলে?

বলে শিউলিদি বুতুসের গাল টিপে দিল।

বুতুসের মনে হল, শিউলিদির আঙুলগুলি ওর ঠোঁটে লেগে কেঁপে কেঁপে উঠল। পরমুহূর্তেই শিউলিদি বুতুসের কপালে চুমু খেয়ে বলল, বাবুসোনা, তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ। অবাক হয়ে বুতুস দেখল দু ফোঁটা গরম নোনা জল পড়ল ওর ঠোঁটে।

শিউলিদি কি কাঁদছে? কেন কাঁদছে? বুতুসের জন্যে শিউলিদি কাঁদবে কেন? বুতুসের সেই মুহূর্তে শিউলিদির জন্যে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। কেউ কারো জন্যে কাঁদুক তা বুতুস ভালবাসে না—বিশেষ করে তার জন্যে কাঁদুক।

বুতুস শিউলিদির হাতের তেলোটা ওর ডানহাতে নিয়ে নিজের বুকের ওপর রাখল, তারপর দুর্বল গলায় বলল, শিউলিদি, তুমি আমাকে ভালবাস?

শিউলিদি হাসি-কান্না মিশিয়ে কেমন করে যেন বলল, খু-উ-ব। তোমাকে খুউব ভালবাসি বাবু।

কেন? আমাকে ভালবাস কেন?

জানি না সোনা। তুমি খুব ভাল বলে। সুন্দর বলে।

বুতুসের মনে হল, অনেকদিন তো সে নিজের মুখ দেখেনি আয়নায়। রোদে দৌড়ে এলে যখন সমস্ত মুখটি লাল হয়ে যায়, কপালে ঘামে ভিজে চুলগুলো লেপটে থাকে, পাতলা ফিনফিনে ঠোঁট দুটো গোলাপী গোলাপী দেখায়, তখন বুতুসের নিজেকে খুব ভাল লাগে। বুতুস নিজেকে ভালবাসে। ও এতদিন জানত যে এমন করে ও একাই ভালবাসে। ও একা একা নিজেকে ভালবাসে। এখন বুতুসের ভেবে আশ্চর্য লাগল যে, শিউলিদিও ওকে ভালবাসে। এ একটা অন্যরকম ভালবাসা। ঠাকুমা মা কাকীমার মত নয়। এ একটা বাইরের ভালবাসা—যা আইনে বা রক্তের জোরে পাওয়া যায় না।

ওর নিজের মুখ বড় দেখতে ইচ্ছে করল। আকাশের রঙের মত, বাতাবী লেবুর গন্ধের মত, বুতুসের মুখকে রোজ নতুন করে নিত্যনতুন ভাবে আবিষ্কার করে বুতুস। কখনো তা পুরনো হয় না। ওর মুখ দেখতে ভারি ইচ্ছে করল।

আয়নাটা একটু দেবে শিউলিদি?

কি করবে বাবু?

মুখ দেখব।

শিউলিদি অবাক হল। শুধলো—মুখ দেখবে? তারপর কি ভেবে বলল—আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছি। আমার চোখে চাও—আমার চোখে তোমার মুখ দেখতে পাবে।

বুতুস উত্তর দেবার আগেই কাকীমা ঘরে এলেন, শিউলিদিকে শুধোলেন, বুতুস কি বলছে রে শিউলি? বুতুসের মনে হল, কাকীমা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শিউলিদি, একেবারে অন্য লোক হয়ে গেল। বলল, ছেলে মুখ দেখতে চায়।

মুখ দেখতে চায় ? কেন ? মুখটা না হয় বুদ্বুসবাবুর খুবই সুন্দর, তা বলে কি অসুখের মধ্যেও শুয়ে শুয়ে দেখতে হবে ? ধন্যি ছেলে তুই বুদ্বুস।

কাকীমা দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটা নিয়ে এলেন, শিউলিদিকে দিয়ে বললেন, দেখা, ছেলের মুখ দেখা। বলেই, চলে গেলেন।

শিউলিদি বুদ্বুসের মাথার কাছে বসেছিল। আয়নাটা দু হাতে ধরে, দুটি হাত ওর বুকের দুপাশে রেখে, ওর চোখের কাছ বরাবর আয়নাটা নিয়ে সোজা করে ধরল। শিউলিদির হারের লকেটটা বুদ্বুসের নাকের সামনে দুলতে লাগল! বুদ্বুস আয়নায় তাকিয়ে দেখল। মনে হল আয়না না, একটি ফটো যেন। শিউলিদি ঝুঁকে পড়ে ফুলমনির বাছুরের মত চকচকে কালো-কালো চোখে বুদ্বুসের দিকে চেয়ে আছে—আর বুদ্বুসকে কেমন করুণ, অসহায় দেখাচ্ছে। সুন্দর দেখাচ্ছে।

বুদ্বুস ভাবল ছোটদের আর মেয়েদের অসুখ করলে সুন্দর দেখায়। কিন্তু বড়কাকুর মত বড় লোকদের অসুখ করলে ভাল দেখায় না। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি বেরোয়, ঝাঁটাকাঠির মত মনে হয়। ভাল লাগে না।

শিউলিদি বলল, বুদ্বুস, আমি যদি তোমার অসুখ সারিয়ে দিতে পারি তো আমাকে কি দেবে ?

বুদ্বুস বলল, যা চাইবে।

মনে থাকবে ?

হ্যাঁ।

শিউলিদি বুদ্বুসের মাথায় এলোমেলো হাত বোলাতে লাগল। চুলের মধ্যে চিরুনী চালাবার মত হাত বোলাতে বোলাতে হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল।

মা কাকীমা সকলে দৌড়ে এলেন।

শিউলিদি মাকে বলল, বৌদি এদিকে এসে দেখ কি ?

বুদ্বুসের মাথায় যন্ত্রণাটা বাড়ল। মা এগিয়ে এলেন, এসে চুল

ঝাঁক করে দেখলেন—বললেন, দেখেছ। এই জন্যে ছেলে বলে মাথায় ব্যথা, মাথায় ব্যথা।

কাকীমা এসে বললেন খুশি খুশি গলায়, তাই তো বলি, ছোট ছেলেরা কত চড়-চাপড় খায়—তা-বলে কারো চারদিন জ্বর হয় না চড় খেয়ে।

মা ফিরে বললেন, সে যাই হোক চামেলি, চড়টা ঠাকুরপো বেশ জোরেই মেরেছিল এবং বিনা কারণেই।

কাকীমা হাসলেন, বললেন, সে আর বলতে। যিনি চড় মেরেছিলেন তাঁর অবস্থা তো কাহিল হয়ে ছিল এ ক'দিন। আজ ধড়ে প্রাণ আসবে।

শেষকালে ঠাকুমাকে ডাকা হল।

ঠাকুমা এসে নির্দয়ের মত, বুহুসকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে একটি প্রকাণ্ড বড় আটালি বুহুসের মাথা থেকে টেনে তুললেন। সে কি এমনি তোলা যায়? মাথার রক্ত খেয়ে খেয়ে একেবারে শক্ত, গোল, জোলো-সাদা, সুনটুনি-মুনটুনি একটি বেলুনবাচ্চার মত হয়ে গেছে সে।

আটালি মাথা থেকে তুলে ফেলার এক ঘণ্টার মধ্যে জ্বর সেরে গেল। সেদিনই দুপুরে বুহুস সাবান দিয়ে চান করে মাছের ঝোল ভাত খেল। সর্ষে দিয়ে ধনেপাতা দিয়ে মা কইমাছ রেঁধেছিলেন। বড় ভাল লেগেছিল বুহুসের।

আটালি কি করে এল? অনেক ভাবল বুহুস আটালি মাথায় কি করে উঠল? পা বেয়ে নিশ্চয়ই উঠেছে। পা বেয়ে এতটা পথ উঠল, আর বুহুস মোটে টেরই পেল না। তা কেমন করে হয়?

হঠাৎ মনে পড়ল বুহুসের, কয়েকদিন আগে কেলো কুকুরটাকে বালিশ করে জলপাইগাছের তলায় পাখির ডাক শুনতে শুনতে দুপুরবেলা ঘুমিয়েছিল। নির্ঘাৎ সেই সময় কেলোর গায়ের আটালি বুহুসের মাথায় এসে বাসা বেঁধেছে। তারপর এ ক'দিনে বেশ বুদ্ধি খেয়ে খেয়ে মোটা হয়েছে। কেলো কুকুরের অবশ্য দোষ কি? ও

তো আর জানে না। আটালিয়া তো আর কেলোর কথা শোনে না। বেচারীর নখও নেই যে তুলে ফেলবে নখ দিয়ে।

এমনিতে কেলো কুকুর বুতুসের ভারি বন্ধু। বুতুস যেখানে যায়, কেলো সঙ্গে সঙ্গে যায়। সাপ দেখলে ঘেউ ঘেউ করে, শজারু দেখলে তেড়ে যায়। ওকে দেখে ছাই-রঙা ছাতারেগুলো কাঁঠালগাছের ছায়ায় ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ করে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে ওকে চটায়। কিন্তু কেলোর ভ্রূক্ষেপ নেই। ও যেখানে যায় সেখানেই নাক উঁচু করে ঠ্যাং তুলে ঘুমিয়ে পড়ে। যখন দরকার হয়, বুতুস কেলোকে বালিশ কি কোলবালিশ করে ঘুমিয়ে পড়ে।

কালিপূজোর সময় পুঁটু কেলোর লেজে তারাবাজি বেঁধে তারাবাজিতে আগুন দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। যতক্ষণ তারাবাতি জ্বলছিল ততক্ষণ কেলো উর্ধ্বশ্বাসে পাগলের মত দৌড়চ্ছিল। কুঁই-কুঁই আওয়াজ করতে করতে আর বুতুসরা কোমরে হাত দিয়ে ফুলে ফুলে হাসতে লেগেছিল।

ধীরে ধীরে রংপুরকে ভীষণ ভাল লেগে যাচ্ছে বুতুসের। মনে হচ্ছে এর পর কোলকাতা গেলে আর ভাল লাগবে না। কিন্তু কোলকাতায়ই বুতুসকে থাকতে হবে। মা, ঠাকুমা আলোচনা করেন, বুতুস শোনে।

যুদ্ধ থামলেই নাকি ওরা কোলকাতায় ফিরে যাবে। ওখানে বাবার একা একা থাকতে খুব কষ্ট হয়। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা তো হয়ই। তাই সুযোগ এলেই বুতুসের বাবা বুতুসদের কোলকাতা নিয়ে যাবেন।

বাবার আসার দিন এগিয়ে এল। এমন সময় একদিন শিউলিদি দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল মাকে, বৌদি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা গেছেন। বুতুস মা-কাকীমার মুখে মুখে শুনেছে তাঁর নাকি অনেক দিন থেকে বাড়াবাড়ি অসুখ চলছিল।

মা, শিউলিদি, কাকীমা সকলে বসে অনেকক্ষণ তাঁর কথা আলোচনা করলেন। 'রথযাত্রা' ছাড়া 'শিশু'র অন্যান্য কিছু কিছু কবিতা বুতুস পড়েছিল। কিন্তু এরকম কত লোকেই তো কবিতা

লেখেন। উনি মারা যাবার খবরে সকলে এমন মনমরা কেন হয়ে গেল, বুহুস বুঝতে পারল না।

কাকীমা বললেন, দিদি আজ আর রান্না-বান্না কিছু করে কাজ নেই।

বুহুস বরং হবিষ্যি ঘরে মা-র সঙ্গে কিছু খেয়ে নেবে।

মা বললেন, তাই ভাল।

শিউলিদি বলল, সন্ধ্যেবেলা আসব বৌদি—একটু গান করব। বুহুস জানে কি গান হবে। শিউলিদি গাইবে, 'ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা, প্রভু তোমার পানে তোমার পানে তোমার পানে…', মা গাইবেন, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা…'

এই গানটি বুহুসের ভারী ভাল লাগে। কেমন যেন শান্তি শান্তি লাগে শুনলে।

বাজার থেকে যে আসছে, সে-ই রবি ঠাকুরের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে আসছে। সকলেই এই আলোচনা করছে।

ইদানীং প্রতিটি দিনই যেন কিছু না কিছু একটা ঘটনার বাহন হয়ে আসছে। পরদিন ভোরবেলা বুহুসের ভাল করে ঘুম ভাঙেনি, এমন সময় ঠাকুমা এসে দরজা ধাক্কাতে লাগলেন।

মা লাফিয়ে উঠে বড়ঘরের দরজা খুললেন।

ঠাকুমা ফিস্ ফিস্ করে বললেন, পুলিস। পুলিস এসেছে। বাড়ির চারপাশ ঘিরে ফেলেছে।

সেজকাকু কিন্তু তখন ওখানে নেই। ভুল খবর পেয়ে এসেছে পুলিস। তবুও বড়ঘরের বারান্দায় দেওয়াল তুলে সেজকাকুর জন্যে যে ছোট ঘর করা হয়েছিল, সে ঘরে সেজকাকুর ভোজালিটি ঝোলানো থাকত। আর কি থাকত বুহুস জানে না।

মা তাড়াতাড়ি একটি চুরুটের বাক্সর মত ডিনামাইটের বাক্স বুহুসের হাতে দিয়ে বললেন, এটা লুকিয়ে ফেল বুহুস। কোথায় লুকোবি?

বুভুস বলল, আমাকে দাও, আমি ঠিক ভালো জায়গায় লুকোব। বুভুস দৌড়ে গিয়ে বাক্সটি নিয়ে কুয়োতলার পাশে ছাইগাদার ধারে কচুবনের নীচে ব্যাঙের ছাতার আড়ালে রেখে এল।

ততক্ষণ বাইরের গেট খুলে দিয়েছে মানসিং। পেছনের গেটও। দলে দলে পুলিস এসে বাড়ির ভিতরে ঢুকল।

একজন দারোগা বললেন, আমরা সার্চ ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসেছি।

বড়কাকু বললেন, সার্চ করুন।

ঠাকুমা সেজকাকুর ভোজালিটা লুকোতে পারেন নি অন্য কোথাও। তাড়াতাড়ি নিজের পেটের শাড়ির খাঁজে গুঁজে ফেলে, ভাল করে গায়ে কাপড় দিলেন।

অনেকক্ষণ ধরে পুলিস সার্চ করল। বড়কাকুকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করল। সব কথা শোনে নি বুভুস।

বুভুসের খালি ভয় হতে লাগল যদি ডিনামাইটের বাক্সটা ওরা খুঁজে পায়? তবে কি হবে? পুলিসরা একবার রান্নাঘরে গেল, ভাঁড়ারে ঢুকে চাল ডালের বস্তাও দেখল, বুভুসের ভারি ভয় করতে লাগল, যদি কুয়োতলাতেও যায়?

কিন্তু গেল না।

ভাগ্যিস গেল না।

পুলিসরা চলে গেলে বুভুস হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ঠাকুমা ভোজালিটা যথাস্থানে রেখে দিলেন।

সকলের জীবনযাত্রা আবার যথারীতি আরম্ভ হল। হাঁসের ঘর খুলে হাঁসগুলোকে ছেড়ে দিল বুভুস। পেঁপেগাছে শালিকগুলো রোজকার মত কিচির-মিচির ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করতে লাগল। কেলোটা লেজ নেড়ে নেড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কাকীমা চা বানালেন। মা-রা সবাই চা খেতে বসলেন বারান্দায়। মানে, রোজ সকালে সুগন্ধি দিনটি যেমন করে টুঙ্‌টুঙিয়ে চলে তেমনি করে চলতে লাগল, এতক্ষণ কার অঙ্গুলি-নির্দেশে দিনটি যেন থেমে গেছিল। দাঁড়িয়ে পড়েছিল। যেন স্ট্যাচু-স্ট্যাচু খেলছিল।

দেখতে দেখতে প্রভাতকাকু এসে হাজির হলেন সাইকেল চড়ে। প্রভাতকাকু বুহুসকে গরমের ছুটিতে পড়াচ্ছেন। বাইরের ঘরের বারান্দায় নির্জন ছায়ায় গোলাপবাগানের দিকে মুখ করে বসে পড়ে বুহুস। প্রভাতকাকুর গলার স্বরটা ভারি, যাত্রার দলের বিবেকের মত। প্রভাতকাকু গান গাইতে পারেন কিনা শুধোয় নি বুহুস।

ফিসফিস করে হাওয়া দেয়। কালোজামগাছের পাতা নড়ে, রঙ্গনের ফুলে ফুলে ফুঁ লাগে, বড় বড় বস্‌রাই, ব্ল্যাকপ্রিন্স সন গোলাপ হেলে-দোলে।

এ গোলাপবাগান দেখতে দূর দূর গাঁয়ের লোকেরা আসে। এই গোলাপের তোড়া বেঁধে অনেককে দিতে হয়। গার্লস স্কুলের হেডমিষ্ট্রেসকেও দিতে হয়। পাশের বাড়ির মিনুদি প্রতিবছর স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করার নিশ্চিত সম্ভাবনাকে সমূলে বিনাশ করার জন্যে বড় বড় তোড়া নিয়ে যায়। পাস না করলে বিয়ে হবে না। সুতরাং প্রতি বছর গোলাপের তোড়া দিতে হয় পরীক্ষা পাসের জন্যে।

মিনুদিকে বেশ লাগে বুহুসের। মোটা মোটা ফর্সা পা-বের-করা ব্রোকেডের ফ্রক পরে মিনুদি মাঝে মাঝে বুহুসদের বাড়ি বেড়াতে আসে। মিনুদিরা নাকি বড়লোক। সেই জন্যে কিনা জানে না, মিনুদির মুখটিতে বেশ গর্ব-গর্ব ভাব আছে একটা। মেয়েদের মুখে গর্ব-গর্ব ভাব থাকলে বুহুসের খুব ভাল লাগে।

মিনুদি চটে গেলে গাল ফুলে ওঠে। একবার শীতকালে ও আর পুঁটু মিনুদির যত্ন-করে-বানানো নুন আর শুকনো-লঙ্কা-ভাজা-বাটা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে শংকামারীর মাঠে বসে পা ছড়িয়ে টোপাকুল দিয়ে খেয়েছিল। সেদিন মিনুদি ভীষণ চটে গেছিল। গাল-ফোলা গোবিন্দর মা হয়ে গেছিল মিনুদি।

শংকামারীর শ্মশানের পথটি বরাবর বুহুসের কাছে এক আশ্চর্য অজ্ঞানতা। দুপাশে ঝুঁকে পড়া গাছ-গাছালি, বাঁশ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে কোথায় কোন অচেনা দেশে চলে গেছে যে, ধুলি ধুসরিত পথটা।

পথে খোঁয়ার পড়ে। পরের ক্ষেতে ঢুকে-পড়া গোরু-ছাগল

ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ভসস্ ভসস্ করে নিশ্বাস ফেলে, সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে লেজ নাড়ে নয়তো কান পত্‌পতায়। কেমন একটা পাঁচমিশেলী গন্ধ। গোরুর গন্ধ, ছাগলের গন্ধ, মাটির ঘরের গন্ধ, খড়ের গন্ধ, পথের লাল ধুলোর গন্ধ, কাঁঠালিচাঁপা ফুলের গন্ধ সব মিলিয়ে এক ভারি মজার গন্ধ। খোঁয়ারের পাশ দিয়ে যেতে আসতেই নাকে লাগে বুতুসের।

ঐ রাস্তায়ই সাইকেল চালাতে শিখছিল বুতুস। ঐ ধুলোতে কি সাইকেল চালানো যায়? ধুপ ধুপ করে পড়তে উঠতে কেটে গেল সারা বেলা। শেষে ধুলো মেখে বাড়ি ফিরল হাত-পা কেটে। কিন্তু যেদিন সাইকেল চালানো শিখে ফেলল সেদিনকার আনন্দের কথা কখনো ভোলা যাবে না। মুখে হাওয়া লাগছে, চুলে হাওয়া লাগছে, বুকে হাওয়া লাগছে, কী সুখে যে বেয়ে চলেছে বুতুস, সে বলার নয়। সেদিনই সাইকেল চেপে ওর সব চেনা লোকের বাড়ি যাবার কথা মনে হয়েছে—কিন্তু মা-র জন্যে যাওয়া হয়নি।

শংকামারীব এই রাস্তাটা রাতের বেলা কেমন যেন মোহময় অপার্থিব হয়ে ওঠে। মুসলমান বাহে ছেলেরা শহরে দুধ বেচে, দুধের হাঁড়ি বাজিয়ে গান গেয়ে গেয়ে অন্ধকারে পথ বেয়ে যায়। সন্ধ্যের অন্ধকারে, ঝিঁঝির ডাকে মুখর, জোনাকির আলপনা-আঁকা পথে পথে তারা গান গেয়ে গেয়ে চলে।

কতদিন ইচ্ছা করেছে বুতুসের যে অমনি কোন ছেলের হাত ধরে শংকামারীর শ্মশানে গিয়ে পৌঁছয় ও। দেখে আসে, কি করে মড়া পোড়ায়। কি হয় সেখানে।

লোকে বলে, পাগলা শিয়াল আছে, ভূত-পেত্নী আছে, মড়ার মাথা থেকে শাঁ-শাঁ করে শিষ বেরোয়। ভয় করে বুতুসের, ভাবতেই ভয় করে।

বাবা এসে পৌঁছনোর দিন-দুই বাকি। মা আজকাল খুশি খুশি থাকেন। পাড়ার ছেলেরা এসে ধরল—বৌদি মাংস খাওয়ান। বেশ খেও। মা গুণে-গুণে টাকা দিলেন। কিন্তু তিন সের মাংসের দামে

প্রায় দশ সের মাংস এসে হাজির। ব্যাপার কি? মাংসে এত লোম লেগে আছে কেন? এত মাংসই বা কি করে এল? জেরা করতে করতে ধরা পড়ল সব, সকলের জারিজুরি।

মহীউদ্দিন মিঞা সকলের সঙ্গে ঝগড়া করত। ছেলেদের ছিল তার উপর ভারি রাগ। একদিন তুপুরবেলা মিঞাসাহেবের বক্‌রী চরছে ভেরেণ্ডার বেড়ার পাশে। বক্‌রী-ঈদের জন্যে মানত-করা বক্‌রী। গায়ে একেবারে জেল্লা মারছে চর্বির চেক্‌নাই। মধুর ফুলে মৌমাছি উড়ছে। নিস্তব্ধ নির্জন পরিবেশ, এমন সময় বেণুদা মারল বডিথ্রো হারাগাছার টীমের গোলকীপারের মত। সাধ্য কি যে বক্‌রী পালায়?

বক্‌রী বলল 'ক্যাঁক'—আর সঙ্গে সঙ্গে গ্যাঁক্ করে তার মুখ চেপে ধরল বেণুদা চিনুদা? তারপর পাঁজাকোলা করে তাকে নিয়ে গেল ক্যানেলের পারে বটতলায়। জায়গাটি নিরিবিলি, জল আছে প্রচুর, ধোয়াধুয়ির অসুবিধে নেই, অতএব সেখানেই 'জয় মা কালী' বলে বলি এবং তারপর তো এই কাণ্ড।

মা কাকীমা ছিঃ ছিঃ করে উঠলেন। বললেন, তোমরা অমানুষ। নিজেদের পাপ আমাদের ঘাড়েও চাপালে।

দাদারা বলল, পুণ্যের ভাগও দেব। চলুন সকলে মিলে 'উদয়ের পথে' দেখে আসি। তাছাড়া, দোষের কি? খোদার বক্‌রী মা কালী খেল। সব ভগবানই তো এক।

জেরা করতে করতে আরো বেরোল যে, ওদের দলে কেবল বক্‌রী-বডিথ্রো এক্সপার্টই নেই, অন্য অনেক রকম এক্সপার্টও আছে। বেণুদার ডান হাতে জোর কম, বাঁ-হাতে জোর বেশি। সব কাজ করে বাঁ-হাত দিয়ে। বাঁ-হাত দিয়ে সাইকেলের বেল বাজায়, বাঁ-হাত দিয়ে নতুন-আনা তেলের শিশির মুট্‌কি খোলে—এমন কি একদিন বুদ্রুসদের বাড়ির দাওয়ায় শুকোনো বড়ি চুরি করায় একটি ঘরামিকে যখন থাপ্পড় মারতে দেখেছিল বুদ্রুস, তখনো সে থাপ্পড়টা বাঁ-হাত দিয়েই মেরেছিল। বেণুদা হলেন গিয়ে সে-দলের মোরগা এক্সপার্টও।

কোনো বর্ষা-শেষের বিকেলে হয়ত মহীউদ্দিন মিঞার কোৎকা

মোরগ ঝিকের ডালে বসে প্রাকৃতিক শোভা দেখছে এমন সময় বেণুদাকে দেখা গেল, হাত পনেরো-কুড়ি দূরে দাঁড়িয়ে বাঁ-হাতে একটি ঢিল নিয়ে আস্তে আস্তে বাঁ-হাতটি সামনে পেছনে আন্দোলন করছেন। আর সমস্ত চোখ-মুখে অর্জুনের মত লক্ষ্য-সন্ধানী দৃষ্টি।

হঠাৎ হাতটা উঠল, শরীরটা একটু বেঁকল এবং কোঁৎ করে একটি আওয়াজ হল।

অতবড় মোরগটি সঙ্গে সঙ্গে ঝুমকো জবার মত ডাল থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেল। ঢিল লেগেছে তার মাথায়।

সব শুনে মা কাকীমা আবার বললেন, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তোমরা এই আজকের মত খেয়ে-টেয়ে বিদেয় হও বাবা। কোনদিন তোমরা দেখছি আমাদেরই খুন করবে।



বুদ্বুসের বাবা এসেই প্রথম যে কাজে হাত দিলেন তা হচ্ছে ফুল-মনির দুধ চুরি বন্ধ করা।

সে এক দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার। সকাল থেকে পনেরো-কুড়ি জন লোক গোয়ালঘর খুঁড়তে আরম্ভ করল, সাপ যে গর্তে সে গর্ত ধরে। খুঁড়ে খুঁড়ে আনারস-বন পেরিয়ে পেছনের বাগানের আলু-ক্ষেতে চলে গেল। সেখানে গিয়ে দেখা গেল সে অন্য গর্তে মিশেছে। আবার খুঁড়তে খুঁড়তে ফিরে আসতে লাগল তারা। পাড়ার দাদা-কাকারা লাঠি নিয়ে কোঁচ্ নিয়ে তৈরি—কখন সাপ মুখ বার করবে। বুদ্বুসের বাবা বন্দুক হাতে নিয়ে একটি মোড়ার উপর বসে রয়েছেন।

কপাত্ কপাত্ করে গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। ঝুপ্ ঝুপ্ করে মাটি

পড়ছে। কেউ বলছে শঙ্খচূড়, কেউ বলছে গোখ্‌রো, কেউ বলছে, দারাজ সাপ ; বিষ নেই।

বুত্‌স কাকীমার ঘরের সিমেণ্ট-করা দাওয়ায় উঠে দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে। উত্তেজনায় ওর হাঁটু কাঁপছে। কী হয়, কী হয়। যদি বাবা গুলি করার আগেই সাপ কামড়ে দেয় বাবাকে ? সাপে কামড়ালে লোক বাঁচে না। বড় কষ্ট হয়। মুখ দিয়ে গেঁজা ওঠে। হরিসভার মাঠে একদিন দেখেছিল বুত্‌স একজনকে। সে অবশ্য বেঁচে গেছিল।

হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—সাবধান! সাবধান!

একটু মুখ বের করেছিল। বাবা অমনি তৈরি হয়ে নিলেন।

পরক্ষণেই ফোঁস করে মাথা বের করে ফণা ধরল এক বিরাট কেউটে সাপ, আওয়াজ হল গুড়ুম।

কা-খ্বা কা-খ্বা করতে করতে টিকিট না কেটে মজা-দেখতে-আসা দাঁড়কাকগুলো লিচু গাছের ডাল ছেড়ে পালাল। মাথা গরম করে দিল চেঁচিয়ে-মেচিয়ে।

এমন সময় আবার আর একটি বেরল, প্রায় একটু পরেই, আবার আওয়াজ হল গুড়ুম।

পাড়া প্রতিবেশী যারা সাপের খবর জানত না, তারা দৌড়ে এল পড়ি কি মরি বন্দুকের আওয়াজ শুনে।

সাপ ছুটিকে টেনে বের করা হল। প্রকাণ্ড বড় একজোড়া গোখরো।

বেচারা দোয়েল বাছুরটি। কতদিন ভাল করে মা-র ছুধ খায় না। ফুলমনির গা ঘেঁষে দাঁড়াতেই ফুলমনি গা চেটে দিল বাছুরের। সকলের খুব আনন্দ হল সাপ মরেছে জেনে। বুত্‌স তো ঐ লিচু গাছের তলাতেই সারা ছুপুর খেলত, কখনো-সখনো বইও পড়ত। ভাগ্যিস, সাপগুলো কিছু করেনি।

বাবা আসার পর থেকে মা যেন কেমন পর পর হয়ে গেছেন। এখন দূরে দূরে ঘোরে। ঠাকুমার কাছে শোয়। সারা ছুপুর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মা আগে বা যেটুকু মানা-টানা করতেন এখন আর তাও করেন না।

ডিমলার রাজবাড়িতে ঘণ্টা বাজে ঢঙা-ঢঙ, ঢঙা-ঢঙ।

নিস্তব্ধ নির্জন দুপুরে বুবুস একা একা বনে-বাদাড়ে বাগানে ঘুরে বেড়ায়। কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে শামুক চলে। ভয় পাইয়ে দিলেই, থমকে থেমে শরীরটা গুটিয়ে নেয়। শামুকের শরীরটার মত যদি বুবুসের ইচ্ছা হত। যদি ইচ্ছা করলেই বুবুসের ইচ্ছাগুলোকে এরকম গুটিয়ে নিতে পারত বুবুস! এরকম গুটিয়ে বাক্স-বন্ধ করে রাখতে পারত! সাহসী টাকা কেন্নোকে টোকা দিতেই ভয়ে ভীরু হয়ে গোল হয়ে টাকার মত হয়ে যায়। চলতে চলতে লজ্জাবতী লতার গায়ে হাত ছুঁইয়ে ছায়াচ্ছন্ন দুপুরে ওদের খামোখা লজ্জা পাওয়ায়। শালিকের ছানা গাছের কোটরে বসে লাল লাল টনসিল বের করে হাঁ হাঁ করে। কাঁঠাল গাছের পাতার আড়ালে বসে বসে বৌ কথা কও ডাকে, বৌ-কথা-কও, বৌ-কথা-কও, বৌ-কথা-কও।

তাও বৌ কথা কয়না। কোনো বাড়ির।

মা-র উপর মনে মনে রাগ হয় বুবুসের। বাবাকে হিংসা হয়। একটা ঢিল তুলে জামরুল গাছের মৌমাছির চাকে মেরে দূর থেকে ছুটে পালায়। ধ্যাৎ! ভাল লাগে না।

হাঁটতে হাঁটতে পুঁটুদের বাড়ি পৌঁছে যায় বুবুস। পুঁটু নেই তা জানে, পুঁটুকে নিয়ে পুঁটুর বাবা দিনাজপুরে গেছেন মামাবাড়ি। পূর্ণবাবুদের বাড়ির পাশের বাড়ির বুটিয়ার কাকা, সেই পাগল ভদ্রলোক কি যেন বলেন। ঈস্-স্, বড় কষ্ট। বাঘকে যেমন খাঁচায় রাখে, এঁকেও তেমনি খাঁচা-বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

ঠাকুমা বলেন, এ পাগল নয় উন্মাদ। বুটিয়ার কাকা ভেংচি কাটেন। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা মাঝে মাঝে কাছাকাছি এসে বসে থাকে।

উনি চেঁচিয়ে গান গান—

> 'আমি যেদিন হারিয়ে যাব বুঝবে সেদিন বুঝবে
> অস্ত-রবির সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুঁছবে,
> বুঝবে, সেদিন বুঝবে…'

নজরুলের কবিতা।

বুহুসের মনে হয়, কারো উপরে অভিমান করে পাগল হয়ে গেছেন বুটিয়ার কাকা। কিসের এ অভিমান জানে না বুহুস।

পুঁটুদের বাড়ি নিস্তব্ধ।

পুঁটুর মা ঘুমিয়ে আছেন বড়ঘরে, খাটের উপর মাদুর বিছিয়ে। হাতের কাছে একটি বই পড়ে রয়েছে। 'বড়দিদি'—লেখকের নাম লেখা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বুহুসের কোনো দাদা দিদি কিছু নেই। থাকলে বড়দিদি কি জিনিস বুঝতে পারত।

শিউলিদি পুবের ঘরে বসে বসে টেবিলের সামনে কি করছে। পা টিপে-টিপে বুহুস ঘরে ঢুকল।

শিউলিদি চুল খুলে চেয়ারে বসে আছে। আসনপিঁড়ি হয়ে। একটু সামনে ঝুঁকে টেবিলে কি যেন কি লিখছে।

বুহুস পা টিপে টিপে একেবারে কাছে গিয়ে চোখ টিপে ধরল শিউলিদিব।

শিউলিদি চমকে উঠে বলল, কে? কে রে?

বুহুস অবাক হয়ে দেখল শ্লেটের উপর শিউলিদি তার নাম লিখে রেখেছে—বুহুস, বুহুস সোনা; বাবু বুহুস, সুষ্টুনি মুন্টনি বুহুস।

কে? কে? ছাড়ো না। মাকে ডাকব কিন্তু। ভাল হচ্ছে না।

অমনি ছেড়ে দিল চোখ বুহুস।

শিউলিদি বুহুসকে দেখতে পেয়ে কী রকম যেন করে উঠল।

অনেক দিন রোদ্দুরের পর হঠাৎ বৃষ্টি হলে, মাটি থেকে যেমন গরম ওঠে, ধুঁয়ো ধুঁয়ো, গরম গরম নিশ্বাস, তেমনি একটি নিশ্বাস ফেলল শিউলিদি।

এবং কোন কথা বলার আগেই তাড়াতাড়ি শ্লেট থেকে বুহুসের নামটি মুছে ফেলল।

আমার নাম লিখেছিলে কেন?

বলব না। আমার খুশি। কেন? তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?

না। আমার নাম লিখবে না।

কেন, না ?

আমার নাম আমার। আমার নাম তুমি লিখবে না।

ঈস্, ভারি তো রে। তোমার নাম লিখতে আমার বয়েই গেছে। এই রোদে রোদে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ? মা জানে না বুঝি ?

মা-র কথা মনে হতেই বুতুসের রাগ হল। কথা বলল না।

কি ?

বাবার সঙ্গে গল্প করছে মা। আমি কোথায় তা মা জানেই না।

ঈস্! বাবু রে আমার! বলে শিউলিদি বুতুসকে কাছে টেনে আদর করল।

বলল, তাতে কি, চল্, তুই আর আমি দুজনে শুয়ে থাকি।

ধ্যাৎ! দুপুরে ঘুমুতে আমার ভাল লাগে না।

তবে চল্ পুকুরপাড়ে বসে আঁচার খাই।

কিসের আঁচার শিউলিদি ?

তুমি কিসের আঁচার খাবে বল ?

একটু ভাবল বুতুস, তারপর চোখ বন্ধ করে বলল, তেঁতুলের।

শিউলিদি ভাঁড়ার থেকে পিরীচে করে নানারকম আঁচার নিয়ে এল। শুধোল, কোন্‌টা খাবে বল ?

বুতুসের জিভে জল এল, আবেশে একটা চোখ বন্ধ হয়ে গেল, অন্য চোখের পাতা কাঁপতে লাগল। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, এটা খাব, ওটা খাব, সব খাব।

সব খাবে ?

সব খাব।

বেশ। চল।

দুজনে ঘাটে গিয়ে বসল।

জল টল-টল করছে। আম আর পেঁপেগাছে ঘিরে রয়েছে পুকুরটি। হাওয়া লেগে জলে টোল পড়ছে। কতগুলি ল্যাটা মাছের বাচ্চা ঘাটের সিঁড়িতে হুড়োহুড়ি করছে। একটি গঙ্গাফড়িং পিড়িং পিড়িং করছে। বাঁ-দিকের হিজল গাছে বসে একটি হলুদ মাছরাঙা

আরামের হাওয়ায় চোখ বুজে বসে থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনটি সাদা দুধলি হাঁস ঢেউ তুলে জল কেটে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে শিউলিদির নিশ্বাসের মত অন্নুচ্চে ডাকছে প্যাঁক-প্যাঁক।

বসে থাকতে ভাল লাগছে না বুতুসের।

ঘাটে বসে পা দোলাতে দোলাতে শিউলিদি বলল, তোরা সত্যি সত্যি চলে যাবি না কি রে বুতুস ?

জানি না। বোধহয়।

কেন চলে যাবি ? আমাদের ভাল লাগে না ?

বা রে। আমি কি তাই বলছি নাকি ?

কলকাতায় গিয়ে আমাদের কথা মনে পড়বে ?

হুঁ।

আমার কথা মনে পড়বে ?

হুঁ।

কি মনে পড়বে ?

তুমি আমার ঠোঁট কামড়ে দিয়েছিলে।

শিউলিদির মুখটা কান্না-কান্না দেখাল, বলল, ব্যস্, আমার কথা কেবল ঐটুকুই মনে পড়বে ?

না। পরে ভেবে বলল বুতুস। শুধু তা কেন, তুমি খুব ভাল, আমাকে খুব ভালবাসতে তাও মনে পড়বে।

পড়বে ? চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল শিউলিদির।

বুতুস বলল, তুমি আমার মাথার আটালি বের করে দিয়েছিলে— মনে পড়বে না বুঝি ?

শিউলিদি খিল খিল করে হেসে উঠল, আওয়াজে ভয় পেয়ে একটি ব্যাঙাচি ঘাট থেকে সোজা পুকুরের দিকে জলের উপর দিয়ে জলছড়া দিয়ে দৌড়ে গেল। গভীর জলে।

কেন জানি না, বুতুসের মনে হল, কথাটা জিগ্যেস করেই ফেলে শিউলিদিকে। যদি ওরা সত্যি সত্যিই এবার বাবার সঙ্গে চলে যায়, তবে হয়তো আর জিগ্যেস করা হবেই না।

একটু দ্বিধা করে বলেই ফেলল বুতুস, তুমি আমাকে এত ভালবাস কেন শিউলিদি ?

শিউলিদি চমকে উঠে বলল, যদি না বলি ?

বুতুস বলল, না বললে নাই। আমি তো চলেই যাব। আবার কি !

আচ্ছা, আঁচারটা খেয়ে নাও। তারপর আমার ঘরে চল, বলব।

আঁচার খাওয়া শেষ করে তুজনে পুকুরের জলে হাত ধুলো। শিউলিদি আঁচল দিয়ে বুতুসের হাত মুখ মুছিয়ে দিল। তারপর বলল, চল এবার যাই !

শিউলিদির ঘরে গেল বুতুস। ছোট একরত্তি ঘর। যে ঘরে শিউলিদি একটু আগে বসেছিল তারই লাগোয়া। কোণায় একটি হলুদ রঙের কাঁঠাল-কাঠের নড়বড়ে টেবিল ছিল। তার ওপরে বই-খাতা, চিরনী, লক্ষ্মীর পাঁচালি, রবি ঠাকুরের সঞ্চয়িতা সব অগোছালো হয়ে ছিল।

শিউলিদি টেনে ড্রয়ারটি খুলল।

বুতুস মুখ বাড়িয়ে দেখতে গেল।

একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরুল, চারটি তেলাপোকার ডিম একদিকে গড়িয়ে গেল। শিউলিদি আঙুল দিয়ে ড্রয়ার নাড়াচাড়া করতে লাগল। সেখানে ছিল না এমন জিনিস নেই। লাল-কালো কুঁচফল, একটি রুদ্রাক্ষের মালা, আঠা-আঠা চুলের গন্ধ-সমেত পাকিয়ে রাখা কালো চুল-বাঁধা ফিতে, চুলের কাঁটা, এক শিশি হেজলিন স্নো।

এসব ঘেঁটে ঘেঁটে শিউলিদি একটি খাম বের করল।

তারপর বলল, আয়, এদিকে আয়।

বুতুস কাছে যেতেই, শিউলিদি খামটি বের করে একটি রঙ-ওঠা ফ্যাকাশে স্যাতপেতে ফটো দেখাল। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, কার ছবি জান ?

বুতুস বলল, না।

শিউলিদি বলল, আমার বন্ধুর।

কে বন্ধু?

আমার ছোটবেলার বন্ধুর।

বুতুস দেখল, একটি তারই মত ছেলে—দেখতে বুঝি বুতুসের মত—সাইকেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে, তার ছবি—গায়ে একটি ডোরাকাটা শার্ট।

বুতুস শুধোল, কি নাম তোমার বন্ধুর?

নাম দিয়ে কি হবে? শিউলিদি বলল। সে তো আর নেই।

এখন তোমার বন্ধু কোথায়?

শিউলিদি কেমন যেন হিমেল হাসি হাসল—তার পর হাত দিয়ে উপরে দেখাল আকাশের দিকে—বলল, তিস্তায় সাঁতরাতে গেছিল একদিন—জেদ করে—ব্যস—আর ফেরেনি। ঠিক তোর মত বোকা ছিল রে বুতুস—জানিস। তোর মত বোকা আর ভাল।

বুতুস বলল এটা কত দিনের ফোটো?

অনেক দিনের। শিউলিদি বলল।

তুমি তখন কতটুকু ছিলে?

তোর চেয়েও ছোট।

ফ্রক পরতে?

হ্যাঁ। শিউলিদি বুতুসের মাথার চুলগুলি এলোমেলো করে দিয়ে বলল, ফ্রক পরতাম, দুদিকে দু বেণী ঝোলাতাম—কুলগাছে উঠে কুল পেড়ে খেতাম। বন্ধুর সঙ্গে কাঁঠালতলার ছায়ায় বসে গল্প করতাম। বেশ ছিল রে দিনগুলো বুতুস।

কেন জানে না বুতুস, হঠাৎ যেন শিউলিদির জন্যে তার মনটা ভারী খারাপ লাগতে লাগল। শিউলিদির হাঁটু জড়িয়ে ধরে ওর শাড়িতে মুখ গুঁজে রইল বুতুস। চুপ করে মুখ গুঁজে রইল। শিউলিদির চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল।

একটু পরে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে শিউলিদি বলল, জানিস বুতুস, আমার বন্ধু ঠিক তোর মত দেখতে ছিল হুবহু। স্বভাবেও তোর মত।

তারপর বলল, চল তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

বুতুস জানে না বেশিদিন এখানে থাকা হল বলে কিনা, সমবয়েসী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া-ঝাঁটি লাগছে। ও লাগায় না, ওরা লাগায়।

একদিন বিশু বলল, সাহেবরা গোরুকে কাউ বলে।

বুতুস বলল, না 'দি কাউ' বলে।

গণেশ বলল, 'ইট ইজ এ কাউ' বলে।

শেষকালে গণেশ আর বিশু একদলে ভিড়ে বলল, কাউ এবং ইট ইজ এ কাউ এ দুটোই হয়, কিন্তু দি কাউ কখনোই হতে পারে না।

এটা স্থিরীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুতুস যখন রাগ করে একা একা বাড়ি ফিরে আসছিল তখন হরিসভার মাঠে ওর পায়ে গোবর লাগল। ও গোবর মাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বিশু আর গণেশ 'মুছে দিচ্ছি, মুছে দিচ্ছি' বলে চোত্‌রা পাতা (বড় বিছুটি) নিয়ে এসে গোবর মোছার ভাণ করে ওর পায়ে ভাল করে ঘষে দিল। চোত্‌রা পাতা দেখতে কদমপাতার মত। অতএব ক্যালকেশিয়ান বুতুস কিছু বোঝার আগেই যা হবার তা হয়ে গেল। গাভি-জাতির জন্যে সারা দিনটি সে বিছুটির যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করে বেড়ালো।

বাবা বললেন, ভাল হয়েছে। ঠেকে শেখা ভাল। যা ঠেকে শেখা যায় তা মনে থাকে। কদমতলায় আর চোত্‌রা পাতায় যে বিস্তর ব্যবধান, তা আর কখনো বুতুসের ভুল হবে না।

বিশ্বাস হল না যদিও, তবু, একদিন সত্যিই সেই দিনটি এসে গেল। একদিন বিকেলে দুটি করে বড় বড় ঘোড়ায়-টানা ঘোড়ার-গাড়ি এসে গেটে দাঁড়াল। একে একে বাবা মা সকলে ঠাকুমাকে প্রণাম করে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। বুতুস সকলকে প্রণাম করল। কাকীমা, তার হলদে হলদে গোলাপী-গোলাপী কাকীমা, অনেক আদর করলেন, সকলেরই চোখ ছল ছল করতে লাগল।

শিউলিদি বুতুসকে বুকের মধ্যে নিয়ে বলল, আবার কবে আসবে বুতুসবাবু?

বুহুস বলল, আমি হাতের লেখা ভাল করে তোমাকে চিঠি লিখ: শিউলিদি, তুমি দেখো।

সুধীনকাকুর মা বুহুসের বুড়ি ঠাকুমা এক-কোঁচড় জল-ভরা লটকা এনে বুহুসকে বললেন, এগুলো তুমি খেও দাছু।

ফুলমনি একবার গোয়াল থেকে 'হাম্বা' করে ডেকে উঠল। রঙ্গনের ডালের বুলবুলিগুলোও যেন বুঝে গেছে .বুহুস চলে যাচ্ছে। কাল ভোরে হাঁসেদের মানসিং কখন খুলে দেবে কে জানে? পুষিটা ফুলবাগান থেকে একলাফে এসে পৌঁছল ঘোড়াগাড়ির সামনে। পুষুমুন্নুর কথা মনে পড়ল বুহুসের। ওর হারিয়ে-যাওয়া অনেক তুপুর, রাতের, বিকেলের স্মৃতি মনে এল।

বাবা বললেন, চললাম মা।

ঠাকুমা বললেন, পৌঁছেই চিঠি দিস।

গাড়োয়ান জিভ দিয়ে আওয়াজ করে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারল —বুহুস ঘোড়ার ঘামের গন্ধ পেল—চাকাগুলো গড়াতে লাগল।

ডিমলার রাজবাড়ির মোড়, নর্ম্যাল স্কুলের মাঠ, কাছারি, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি, জেলা স্কুল সব এক এক করে পেরিয়ে গেল গাড়ি।

আকাশে মেঘ করেছে। ঘন ঘন বিত্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি নামবে হয়তো এখুনি। একটু পরে কি হবে বাড়িতে বুহুস দেখতে পাচ্ছে। কাকীমা এতদিন পর একা রান্নাঘরে বসে আছেন। ঝমঝম করে টিনের চালে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি থেমে গেল। হাওয়াতে সোঁদা মাটির গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। উনুনে ভাত ফুটছে ছল ছল—ছলাৎ ছলাৎ। বুহুসদের ক্ষেতের চালের ভাত, লাল লাল মোটা মোটা মিষ্টি চালের ভাত, দেশের চালের ভাত—সেই ফোটাভাতের ফ্যানের গন্ধ নাক ভরে নিয়ে এসেছে বুহুস। জীবনের শেষদিন অবধি চোখ বুজলেই সেই গন্ধ সে নাকে পাবে।

বাবা মাথা বের করে বললেন, কোচোয়ান ভাই, একটু জোরে চল হে, বৃষ্টি এসে পড়ল বলে।

টগ্‌বগ টগ্‌বগ করে চলেছে গাড়ি।

পেছনের গাড়িতে বড়কাকু মালপত্র নিয়ে আসছেন।

'কোথায় ছিল ? কে আনিল ? অস্তি গোদা...' গান মনে পড়ে হাসি পেল বুতুসের।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...পাশে পাশে কে এল সাইকেলে চড়ে ? আরে প্রভাতকাকু যে !

সেদিন পড়া-নেওয়া—প্রভাতকাকুর গম্ভীর মুখটি ভুলে গেল বুতুস—মনেই পড়ল না।

প্রভাতকাকু বললেন, কী বুতুস চলে যাচ্ছ ? আবার কবে আসবে?

দেখে মনে হল প্রভাতকাকুরও মন খারাপ।

বুতুস কি জানে ? বাবা সামনে বসে আছেন, বাবাই জানেন। আদৌ আর আসবে কি না।

বাবা বললেন, দেখি রে আবার কবে আসা হয়।

পুজোর সময় এসো বুতুস—আবার আমরা কলাগাছের ভেলায় চড়ে প্রতিমা বিসর্জন দেব।

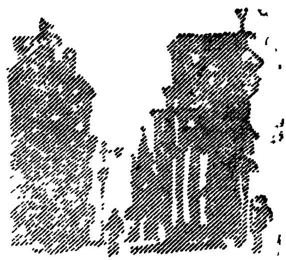
বুতুসের মন বলে, আচ্ছা, আচ্ছা। নিশ্চয়ই আসব। কিন্তু বাবা সামনে বসে আছেন। মুখে চুপ করে থাকে। চোখ দিয়ে যা বলার বলে।

এবার একটা মোড় নিল গাড়ি। ভূপতিকাকুর ডাক্তারখানা পাশে ফেলে এল, কৈলাসরঞ্জন স্কুল পেছনে ফেলে এল, এবার রংপুর স্টেশনে দেখা যাচ্ছে। মেঘলা বিকেলের সান-বাঁধানো উঁচু প্ল্যাটফর্ম। সজনে আর কৃষ্ণচূড়াগাছ, রেলিংয়ের পাহারা।

একটি আদিগন্ত ভাল লাগা ভেদ করে এসে ওর নিজস্ব দুপুর-গুলির দরজা পেরিয়ে একটু পরেই স্টেশনের গরাদ-ঘেরা প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়বে বুতুস। তারপর কোলকাতার কয়েদী হবে। ভাবলেও কান্না পায় বুতুসের। সেই কোলকাতা, যেখানে ইট, কাঠ, কনক্রীট, যেখানে দিগন্ত দেখা যায় না কখনও, সেই গণ্ডীমাপা জীবন; নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে বুতুসের।

সেদিনের সেই চোত্‌রা পাতার জ্বালাটা শুধু পায়ে সীমিত না থেকে ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সারা মনে।

দ্বিতীয় অধ্যায়



ট্রামলাইনের পাশে ট্রামের তারের পোস্টে কান লাগিয়ে বুতুস দাঁড়িয়েছিলো।

দূর থেকে শব্দটা শোনা যাচ্ছিল—রসা রোড থেকে ট্রামটা ঘুরলো—ট্রামটা আসছে—গোঁ-ও-ও-ও-ও একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আওয়াজটা জোর হতে লাগল, আরো জোরে—তারপর ট্রামটা বুতুসের পাশ ঘেঁষে চলে গেল।

তুপুরবেলার ট্রামেদের একটা নিজস্ব ভাষা আছে তুপুরবেলার কাকেদের মত।

যখন কোলকাতার পীচ গলে, ক্লান্ত ফিরিওয়ালা একটানা বাঁধা সুরে হেঁকে যায় ডাব নেবেন মা, ডাব—ডাব নেবেন মা ডাব, তখন ট্রামগুলোও কেমন একটা ফাঁকা আওয়াজ করে একা একা ফাঁকা পথের হা-হা হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলে। গুমটিতে গুমটিতে ওরা তখন বুড়ি-ছোঁওয়া খেলে।

একটা কাক পাঁচিলের দেওয়ালে বসে ডাকল, খা খা—তার পর নবনী পিসীর বাবার ফেলে-দেওয়া কদবেলের খোলাটায় তুটো টোক্কর মারলো নিষ্ফলে—তার পর হতাশ হয়ে আবার খা খা করে উড়ে গেল।

বুতুস প্যাণ্টের ডান দিকের পকেটে হাত ঢোকালো। বাঁ-দিকের পকেটটা ছেঁড়া। ডানদিকের পকেটে হাত ঢোকাতেই জিনিসটায় হাত ঠেকল। একটি তু'আনি।

বুতুস পায়ে পায়ে রাসবিহারীর মোড়ে পৌঁছে গেল—দোকানটায় ঢুকে পড়ল। ঢুকেই বসে পড়ল।

লোকটা একটি ত্রিপলের ছোট থলেতে বরফ ভাঙছিলো—ধাঁই ধপ্ ধাঁই ধপ্ করে। একটি বড় এনামেলের হাঁড়িতে মাঠা রাখা আছে। অন্য হাঁড়িতে পাতলা ঘোল। অনেকগুলো সারি সারি রঙিন শিশি—কত রকম যে সিরাপ্ তা বুতুস কি বলবে—কিন্তু বুতুস যখনি আসে তখনি কেবল একটি সরবৎই খায়। বুতুসের নাকে সে গন্ধ লেগে থাকে—রাতের বালিশেও ও সে গন্ধ পায়—ম্যাঙ্গো—সবুজ মিষ্টি মিষ্টি কাঁচা আমের গন্ধভরা এক গ্লাস সরবৎ ত না যেন এক গেলাস অমৃত।

বুতুস চুক্‌চুক্ করে চুমুক দেয়—জিভ দিয়ে বরফের কুঁচি ভাঙ্গে তার পর আবার একটু খায়—এমনি করে হঠাৎ তার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে পুরো গেলাসটি খালি হয়ে যায়। পয়সাটা দোকানীর হাতে গুঁজে দিয়ে বুতুস দোকান থেকে বেরিয়ে আসে—শূন্য গেলাসটি ফেলে রেখে। তার পর খাঁ-খাঁ রোদদুরে হেঁটে বাড়ি ফেরে। বাড়ির বাইরের ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে রেখে গেছিল বুতুস—সাবধানে ঠেলে ঢুকতেই একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়তে হল।

রত্না সবে একটা গুণ্ডি পান মুখে দিয়ে দুপুরের ঘুমের বন্দোবস্ত করছিল—এমন সময় দরজায় কিঁয়াচ্ করে আওয়াজ করে বুতুস ঢুকলো।

কি গো বুতুসবাবু কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?

এই মানে, এমনি।

এমনি মানে ?

এমনি মানে, এমনি ; সামনের দোকানে।

তোমাকে না মা অঙ্ক কষতে বললেন।

হ্যাঁ। অঙ্ক ত কষছি—তুমি ঘুমোও না। তুমি ঘুমোলেই আমি অঙ্ক করব। তুমি ভীষণ বকো।

রত্না বলল, আমি বকছি না তোমাকে দাদাবাবু, তুমি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ আর মা ভাবছে তুমি খুব অঙ্ক করছো—তাই বলছি।

বুতুস আর কোনো কথা বলল না। টেবলটার সামনে চেয়ারটি টেনে বসে পড়ল।

অঙ্ক করতে ভালো লাগে না বুতুসের। তার চেয়ে ইংরিজি বাংলা পড়তে ভাল লাগে। তবু হোম-টাস্ক্ করতে হবেই। কারণ হোম-টাস্ক্ না করে খেলতে গেলে খেলতে পারবে না বুতুস। ওর মনে সব সময় কি একটা কাঁটার মত বিঁধবে—ও খেলে সুখ পাবে না—এমন কি গোল দিতেও পারবে না। ঠিক-সময়মতো ও অন্যমনস্ক হয়ে যাবে—হোম-টাস্কের কথা মনে পড়ে যাবে। তার চেয়ে সব টাস্ক্ করে তারপর খেলতে যাওয়া ভাল। অন্ততঃ ওর খুব ভাল লাগে, হাল্কা লাগে।

বুতুস অঙ্ক কষতে লাগল।

কতক্ষণ কেটে গেছে মনে নেই। রত্না ঘুমিয়ে পড়েছে। কাত হয়ে ঘুমোচ্ছে ও। ওর তেলচিটে বালিশে ওর কষ বেয়ে পানের পিক্-মেশানো লালা গড়িয়ে পড়ছে—মাঝে মাঝে কোনো ভিন্‌দেশী মাছি এসে রত্নার পানখাওয়া মুখের কাছে গুন্ গুন্ করছে।

বুতুস ভাবল, অঙ্কগুলো সব শেষ করে ফেলবে—নইলে বিকেলে যখন দেশপ্রিয় পার্কের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকবে ও, বিনু যখন খুব জোরে বল নিয়ে ড্রিবল করতে করতে ওর দিকে এগিয়ে আসবে, তখনো ও অমনি দাঁড়িয়েই থাকবে। ফুরফুরে হাওয়া লাগবে গায়ে—কিন্তু পেটের কাছটা কেমন ব্যথা ব্যথা লাগবে, কেবলি মনে হবে—ও টাস্ক্ করেনি, ও অন্যায় করেছে। ওর খেলতে আসা উচিত হয়নি।

বুতুসের বাবা সব সময় বলেন, "খেলার সময় খেলা, পড়ার সময় পড়া।" আর বুতুসের ঠিক উল্টো। যখনি পড়তে বসে, তখনি গান গাইতে ইচ্ছে করে, নইলে কবিতা লিখতে। কাউকে বলেনি বুতুস, কিন্তু বুতুস আজকাল কবিতা লিখছে। মানে লিখতেও চায় না। পাকড়াশীবাবুর কানমলা খেতে হবে অঙ্ক না করে গেলে, তা জানা সত্ত্বেও কার কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে? কিন্তু বুতুসটা এমন বোকা যে, বুতুস তবু কবিতা লেখে।

জানালা দিয়ে পাশের গলির দিকে যখনই চায় তখনই অমনি মন কেমন। এ-গলি বাইরের গলি। শ্যাওলা পড়া স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা মাটি—

কুল্ কুল্ করে নর্দমা দিয়ে জল বইছে—গরমের দুপুরে কেউ কোথাও নেই—পেছনের মাঠ পেরিয়ে বিলুদের বাড়ির রেডিওতে "হারা মরু নদী ক্লান্ত দিনের পাখি" গান হচ্ছে—এই সব তুচ্ছ ও সামান্য ভালো লাগাতেই বুহুস ভালো লাগায় মরে যায়।

কিন্তু মায়ের ঘর পেরিয়ে পাশের কোণার ঘরে গেলে সে এক আশ্চর্য জগৎ। জানলা দিয়ে চাইলে সেই ছোট্ট গলিটিতে যে কত বিচিত্র জিনিসের মেলা। বুহুর ইচ্ছে করলে সারা দিন ঐ গলিতে চেয়ে বসে থাকতে পারে। কত কী জিনিস—কত কী জিনিস। ফেলে দেওয়া আমের আঁটি থেকে গজিয়ে-ওঠা কচিকলাপাতা রঙা পাতায় ভরা চিকন গাছ—ভাঙ্গা কাঁচের গেলাস—পুরোনো দাড়ি কামানোর ব্রাশ, একটা লাল রঙা মারবেল, লিচুর বিচি, ভাঙ্গা চিরুনি, ছেঁড়া ব্লাউজ, একপাটি বিদ্যাসাগরি কালো চটি আরো কত কি, কত কি।

আমের চারাগাছে রোদ পিছলে যায়—হুটি শালিক এসে কী যেন খুঁটে খুঁটে খায়—পাশের বাড়ির কার্নিসে ঘাড়ে-গর্দানে হুলো-পায়রা বুকু বুকুম, গুকুম্ বুকুম করে। এই নিস্তব্ধ অতীতের অসামান্য সামান্যতায় বুহুস আবিষ্ট হয়ে পড়ে। বুহুসের অঙ্ক কষতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে কবিতা লেখে—অথবা কিছুই না করে চুপ করে জানলার তাকে বসে ভাবে। অথবা গান গায়। রবি ঠাকুরের গান। নীচু পর্দায়; খালি গলায়।

দেখতে দেখতে এক সময় বিকেল হয়ে যায়।

·মা ঘুম থেকে ওঠেন—হাই তোলেন—চুল বাঁধেন, তার পর বুহুসকে খেতে দেন। খেয়ে-দেয়েই বুহুস খেলতে চলে যায়।

অনেকে আসে। সকলেই স্কুলের বন্ধু নয়। যে চাঁদা দেয় তাকেই খেলতে দেয় বিশুদা। সব ছেলেকে বুহুসের ভালো লাগে না। আসলে খুব কম ছেলেকেই লাগে। কেন ভাল লাগে না, তা বুহুস জানে না। বোধ হয় ওরা যখন-তখন আলুকাবলি বা থার্মোফ্লাস্কে করে ফেরি-করা লাল নীল আইসক্রীম খায় বলে কিংবা মেয়েদের সম্বন্ধে যা-তা কথা বলে ব'লে।

একদিন গিরিন বলল, বিজুর পিসতুতো বোনকে দেখলেই পাউডার মাখিয়ে চুমু খেতে ইচ্ছে করে।

কথাটা শুনে বুড়ুস চমকে উঠেছিল। ও বাচ্চা বাচ্চা বমির-গন্ধ মাখা অনেক ভাই বোনদের চুমু খেয়েছে—চুমু খেতে ভালোই লাগে। তারপর রংপুরে শিউলিদি ওকে ঠোঁট কামড়ে চুমু খেয়েছে। কিন্তু পাউডার মাখিয়ে চুমু খাওয়াটা কি জিনিস বুড়ুসের মাথায় এলো না। তবে এটুকু বুঝলো চুমুটা তাহলে বেশ সুগন্ধি হবে।

তার পরই বুড়ুসের মনে হল, দাদামশায় এবার থেকে চুরুট খেয়ে ওকে চুমু খেতে এলেই ও বলবে, দাদু দাঁড়াও দেখি—একটু পাউডার মাখিয়ে নিই।

দাদু বলবেন, সে কি রে ?

বুড়ুস বলবে, হ্যাঁ, নতুন শিখেছি।

ধ্যুৎ দাদুর চুমু ভাল না—এমন বিট্‌কেল চুরুটের গন্ধ মুখে, তার পর কাঁচা-পাকা এত খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ভাল লাগে না।

বুড়ুস হাফ ব্যাকে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিন। গায়ে ফুরফুর করে হাওয়া লাগছিল। অন্যদিন ও রাইট ইন্‌-এ খেলে কিন্তু সেদিন ওর হাফ-ব্যাকে খেলার কারণ ছিল।

দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে বুড়ুস একবার বিজুর পিসতুতো বোনের কথা ভাবলো। বেশ দেখতে মেয়েটি। কি যেন নাম, স্বপ্না না কি যেন। কেমন মাজা-মাজা রঙ—গলায় একটি চিকন সোনার হার—বড় বড় দুটি কালো কালো চোখ—এমন করে চোখ তুলে তাকায় না—চোখের দিকে তাকালেই বুকটার মধ্যে কেমন অস্বস্তি লাগে। এ জন্যেই বুড়ুসের এ সব ভালো লাগার মত মেয়েদের এত ভয় করে। এমনিতে ত কত ঝামেলা—রাস্তা দেখে পার না হলেই এ্যামেরিকান কি নিগ্রো মিলিটারী ট্রাক-ড্রাইভার চাপা দিয়ে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে দেবে—ক্লাসে অঙ্ক না পারলে পাকড়াশীবাবু কান মলে দেবেন—রাস্তার আলো জ্বলবার পর বাড়ি ফিরলে মা বকে একসা করবেন—এমনিতেই ত বুড়ুসের অনেক অনেক যন্ত্রণা। তার মধ্যে আর নতুন করে যন্ত্রণা বাড়াতে চায় না বুড়ুস।

বুহুসের ভগবানের উপর ভীষণ রাগ হয়। মেয়েদের এত সুন্দর করে দেবার কি মানে হয়। ফুলমনি গোরুর অত বড় বড় চোখ—কই? তবু ফুলমনি চোখের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকালে ত বুকের মধ্যেটা এমন করে না—তা বিজুর পিসতুতো বোন তাকালে করে কেন?

নাঃ—এসব ভাবনার শেষ নেই।

ইতিমধ্যে একটা গোল খেয়েছে বুহুসরা—দেখতে দেখতে বিশুদা আর একটা গোল দিয়ে দিল।

বিজু উত্তেজিত হয়ে বলল, বুহুস তুই আবার আজকে পেছনে কেন—সামনে আয়! রোজ রাইট্-ইন খেলিস—আজ আবার তোর কি ঢং হল?

বুহুস বলল, ঢং নয়—কারণ আছে।

কি কারণ?

তা আমি বলতে পারব না।

বিজু রেগে বলল, ন্যাকামি করিস না-ত। নে চল্। তুই রাইট-ইন্-এ এলে আমরা দু মিনিটের মধ্যে গোল শোধ দিয়ে দেব।

বিজু প্রায় জোর করে বুহুসকে টেনে নিয়ে গেল সামনে।

বুহুস দেখল—সেই গোলপোস্টের পাশের বড় আমগাছটির নীচের বেঞ্চিতে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক—এবং একজন বৃদ্ধা মহিলা বসে আছেন। তাঁরা সেখানে বসে রোজ খেলা দেখেন। আজকে আবার বুহুসের সমবয়েসী তাঁদের সুন্দরী নাতনীও বেঞ্চিতে বসে আছে। সে বোধ হয় আলাদা এসেছে। পরম যত্নে শালপাতায় মুড়ে নিয়ে কাঠি দিয়ে দইবড়া খাচ্ছে!

বুহুস মাকে খুব ভালোবাসে—তবু সেই মুহূর্তে মার উপরে ওর খুবই রাগ হতে লাগল।

এতবার করে মাকে বলল, তবু মা ওর কথা শুনলেন না—এখন এই মুহূর্তে যদি কোনো কেলেঙ্কারী ঘটে যায় ত কে সামলাবে?

মা বলেছিলেন, বিপদে পড়লে গোপালকে ডাকবে—বুহুস

গোপালকে ডাকতে লাগল। অথচ বাচ্চা গোপালের গোল-ছাপু হাতে-নাড়ু ছবি দেখে বিপদের সময় সে যে কি করে অন্যকে উদ্ধার করবে সে বুদ্ধি বুহুসের মাথায় কুলোয় না। ছোটবেলায় সকলেই অমন উলঙ্গ বাহারে মেঝেময় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়—কিন্তু তার জন্যে কেউ ত তাদের পূজো করে না। আসলে যশোদা মার চেহারাটা বেশ গাঁট্টা-গোঁট্টা—গোপালকে ডাকলে তিনিও নিশ্চয়ই আসবেন।

যাকৃগে—বুহুস গোপালকে না ডেকে প্রাণপণে রংপুরের ক্যানেলের পারের ভগবানকে ডাকতে লাগল।

সেণ্টার হয়ে গেল—মুহূর্তের মধ্যে বুহুসেব পায়ে বল চলে এল এবং একবার বল পায়ে চলে এলে অন্য কোনো কথা তখন মনে থাকে না। সামনে কেবল গোলপোস্ট, এবং নিজের বিপরীত দিকে কতগুলি এ্যাংকলেট পরা দ্রুতগতি তিড়িং-বিরিং পা দেখা যায় শুধু—বুহুস বল নিয়ে বিহ্যৎগতিতে বেরোতে লাগল—হুজনকে কাটিয়ে ফেলল, মোটা গোলকিপার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি কোলা ব্যাঙের মত থপ-থপিয়ে লাফাতে লাগ্‌ল এবং বুহুসকে দেখতে লাগল—এবার কিক্ করবে বুহুস—বাঁ-পায়ে সামনের দিকে বলটা একটু ঠেলে দিল ডান পা পেছনে নিল—মারবে এবার—ওয়ান-টু-থ্রী—

এমন সময় হুর্ঘটনাটা ঘটল—হঠাৎ কোমরের কাছে গুটোনো বুহুসের বাঁ হাতে কি যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগল—বুহুস সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবাউট-টার্ণ্‌ হয়ে গেল এবং মনে মনে ভগবান এবং মাকে খুব গালাগালি করতে লাগল।

বলটা অভিমানে গড়াতে গড়াতে কর্ণারের সীমানা পেরিয়ে চলে গেল।

বিজু দৌড়ে এল। বলল, কি রে? এমন গোলটা নষ্ট করলি? তুই কি রে? কোনো মানে হয়? স্টুপিড।

বুহুস প্যাণ্টটা টেনে তুলল।

কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, কি করব বল? মাকে এত করে বললাম যে বোতামটা লাগিয়ে দাও—মা শুনলোই না—একটা বোতাম ছেঁড়াই ছিল—অন্যটা ঝুল্ ঝুল্ করে ঝুলছিল।

বিজু তখনো রেগে বলল, তাতে গোল দেবার অসুবিধা কি হল ?

হল, হল, যা হবার তাই হল, তুই একটা গাধা, তাই বুঝতে পারছিস না।

বিজু তাও বুঝলো না—না বুঝে আবার সেণ্টার লাইনে ফিরে গেল।

বুবুস বলল, আমি পেছনে যাচ্ছি—বলে হাফ লাইনের দিকে যেতে লাগল। যেতে যেতে হঠাৎ একবার সেই আমগাছের নীচের বেঞ্চে তাকাল—দেখল সেই সুন্দরী মেয়েটি আর বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা হাসি হাসি মুখে বসে আছেন।

বুবুসের কান লাল হয়ে গেল। নিশ্চয়ই ওরা দেখেছে।

সত্যি! মাকে নিয়ে চলে না—এত করে বলল—তবু মা কথা শুনলো না, বলল, পরে হবে। তার উপর জাঙ্গীয়াটাও ভিজেছিল। সেটা পরে এলে ত এই কেলেঙ্কারীয়াস ব্যাপার হতো না।

বুবুসের সেদিন খেলাটাই মাটি হল। কোনোরকমে খেলা শেষ করে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে বেঁকে বেঁকে হেঁটে বুবুস বাড়ি ফিরল।



গড্‌রেজের আলমারীটায় হেলান দিয়ে মাদুরে বসে মা বুবুসকে পড়াচ্ছিলেন।

রোজ সন্ধ্যায় ভাল করে সাবান দিয়ে গা ধুয়ে মা বুবুসকে পড়াতে বসান। মার সাবান-মাখা ঠাণ্ডা-গায়ের গন্ধ বুবুসের দারুণ ভাল লাগে। মা পড়ান এবং সেই জন্যেই বুবুস প্রত্যেকবার ক্লাসে সেকেণ্ড থার্ড হয়।

বুবুস মাকে জিগ্যেস করল, মা মধ্যবিত্ত মানে কি ?

মা বললেন, মধ্যবিত্ত মানে আমরা—খুব গরীবও নই—আবার বড়লোকও নই।

বড়লোক কারা? যাদের বাড়িতে মেজমামার মত স্প্রিং-এর খাট আছে?

মা হাসলেন, বললেন, আরো অনেক কিছু আছে—টেলিফোন, গাড়ি; নিজেদের বাড়ি।

বুতুস বলল, আমার বড়লোকদের দারুণ লাগে।

কেন?

কেন জানি না। কি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ি, কি সুন্দর পোষাক, মেয়েরা কি সুন্দর বড় বড় পিয়ানো বাজিয়ে দু বিনুনী করে গান গায়—বড়লোকদের গা থেকে সবসময় সুন্দর গন্ধ বেরোয়—তাই না মা?

মা হাসলেন, বললেন, ঠিক আছে তোমার সঙ্গে খুব বড়লোকের মেয়ের বিয়ে দেব।

বুতুসের কান লাল হয়ে গেল। বলল, ধ্যুৎ।

বিয়ের কথায় বুতুসের পুঁটুর কথা মনে পড়ল।

পুঁটু কলকাতায় একটি চিঠি লিখেছিল—আঁকাবাঁকা অক্ষরে—হাতের লেখাটা খারাপ, তবে বুতুসের বাবার চেয়ে ভাল।

লিখেছিল, বুতুস চলে আসাতে ওর বড়ই একা একা লাগে—বর্ষা হচ্ছে প্রায়ই—ওরা ক্যানেলে ও ধানক্ষেতে পোলো দিয়ে খুব মাছ ধরছে। সেদিন একটা দাঁড়ে-বসা মুরগীর ডিম যেই পেট থেকে পড়েছে পুঁটু একেবারে গরম গরম ক্যাচ ধরেছে—লিখেছে, ও ডিমটা কেমন নরম তুলতুলে হয়ে বেরোলো—তারপরই হাওয়া লেগে শক্ত হয়ে গেল।

এই সব লিখেছিল। তারপর অনেকদিন হয়ে গেল—আর কোনো চিঠিপত্র নেই।

মধ্যবিত্ত এই কথাটা বেশ ভাবিয়ে তুললো বুতুসকে—বুতুস জানে আসলে ওরা গরীব—মধ্যবিত্ত কথাটা ভাল শোনায় বলে বুতুসের মা ঐ কথাটা ব্যবহার করেন।

কালোমামার বৌভাতের দিনের কথা মনে আছে বুতুসের। তখন মামাবাড়ির সঙ্গে লাগোয়া অনেকখানি জায়গা ছিল। বিলিতি আমড়ার গাছটা—বড় বড় ঘোরানো চওড়া খোলা বারান্দা। লোকজন বেশী হয় নি—সাদামাটা বিয়ে। সানাইও আসেনি। সকলে মিলে পরিবেশন করল। বুতুস নুন পরিবেশন করল।

বুতুসের পায়ে তার আগের দিন, গলিতে গুলি খেলার সময় একটি মরচে-পড়া পেরেক ফুটে গেছিল—পা-টি ফুলে গেছিল, পায়ে খুব ব্যথা ছিল, তবু সকলেই কাজ করছে দেখে ও-ও কাজ করেছিল।

কাজ মিটল রাত এগারোটায়। বাবা, মা ও বুতুস হাঁটতে পারছিল না, পা-টা ফুলে গেছিল, পায়ে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল, কাপড় দিয়ে বরিক পাউডার দিয়ে বেঁধে রাখা সত্ত্বেও পা-টা টন্‌টন্ করছিল।

বুতুসরা হাজরা লেন আর মতিলাল নেহেরু রোডের মোড়ে এসে পৌঁছল গ্যাসের বাতির নীচে একটি রিক্সাওয়ালা বসেছিল। বাবা বললেন, রাসবিহারী এ্যাভিন্যু যাবে? কত নেবে?

সে বলল, বারো আনা।

বাবা বললেন, দু' আনা দেব।

সে বলল, হবে না বাবু।

বাবা বললেন, ভেবে দেখো।

রিক্সাওয়ালাটি ভাবতে লাগলো, আর বুতুস আকুল চোখে গ্যাসের মিটমিটে আলোয় তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, মনে মনে বলতে লাগলো, রাজী হয়ে যাও না রিক্সাওয়ালা—রাজী হয়ে যাও না—তুমি রাজী না হলে বাবা রিক্সা নেবেন না, কারণ, বাবার পয়সা নেই—আর রিক্সা করে না গেলে এতখানি পথ বুতুসকে ঐ খোঁড়া পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হবে—বুতুস ভেবেই ভয়ে মরে গেল, কিন্তু বাবাকে ভয়ে বলতে পারল না কিছু।

বুতুস বাবাকে ভয় করে—ভয় করে এসেছে বরাবর—বুতুসের যতই কষ্ট হোক্ বুতুস বলতে পারল না। মা একবার বুতুসের পায়ের দিকে তাকালেন, তারপর বাবার মুখের দিকে।

রিক্সাওয়ালা বলল, নেহি হোগা বাবু।

বাবা বললেন, আট আনা নাও।

নেহি বাবু, বারো আনা।

বাবা বললেন, তব্ ছোড়ো।

বুহুস আবার রিক্সাওয়ালার মুখের দিকে তাকাল, তারপর বড় কষ্টে পা টেনে টেনে চলতে লাগল। চলতে চলতে বুহুস ভাবল, বুহুস নিজে হয়ত একদিন বড়লোক হবে। ভাল করে লেখাপড়া করবে—গাড়ি চড়বে—কিন্তু সেদিনের গাড়ি চড়ার আনন্দ আজকের এই যন্ত্রণার উপশম করতে পারবে না। বুহুস ভাবল—ভবিষ্যতে বড়-লোক হয়ে লাভ নেই—যখন যেটা নিতান্ত প্রয়োজন সেটা না পাওয়া গেলে ভবিষ্যতে বিশ্বাস করে কিছু লাভ নেই। পা ভাল থাকলে বুহুস হাঁটতে ত ভালোই বাসে—অথচ বুহুসের বাবার পয়সা নেই বলে আজ বুহুসকে এই অসহ্য কষ্ট করতে হল। বুহুসের বাবা মধ্যবিত্ত না হয়ে বড়লোক হলে পা ভাল থাকা সত্ত্বেও হয়ত ওদের ট্যাক্সি করে নিয়ে যেতেন।

বুহুস ধুতি-পাঞ্জাবী পরা আগে-আগে হাঁটা তার লম্বা বাবার দিকে দিকে তাকিয়ে ভাবল, বাবা কি কোনোদিন বড়লোক হতে পারবেন? কেন জানে না, বুহুসের সেই নির্জন রাতের ফুটপাথে খোঁড়া গোরুর মত পা টেনে টেনে চলতে চলতে মনে হল, না। বুহুসের বাবা কোনোদিন বড়লোক হতে পারবেন না। এইটা মনে হয়ে বুহুসের মনে কোনো দুঃখ হল না। জানার জিনিস যেমন করে জানে—বাবা-মুরগীর যেমন ডিম হয় না জেনেছিল—তেমন করে জানল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে—পায়ের যন্ত্রণায় এ সব কথা একেবারে ভুলে গেল।

এসব নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন বুহুসের ভালো লাগে না। বুহুসদের বাইরের ঘরের জানলার তাকটি বড় প্রিয় বুহুসের—সেই তাকে বসে জানালার শিক ধরে নিমগাছটির ফিন্‌ফিনে পাতাদের দিকে চেয়ে বাগানের গাছপালার সঙ্গে কথা বলে, সোঁদা সোঁদা মাটির গন্ধ নাকে নিয়ে বুহুসের একা একা দিন চলে যায়।

রাতগুলো আরো ভাল লাগে। যখন রংপুরে ছিল তখন ভাবতেই পারেনি বুচুস—মানে একেবারে ভুলেই গেছিল যে কোলকাতায়ও এত ভালো-লাগা আছে।

আসলে বুচুস ত বড় হচ্ছে, বুচুস এখন বুঝতে পারে, যে ভালো-লাগা কোনো জায়গাবিশেষে বাঁধা থাকে না—ভালো-লাগা নিজের নিজের মনে বয়ে বেড়াতে হয়—তাহলে যখনই যেখানে থাকা যায়—যাওয়া যায়—তখনি ভালো লাগে।

সন্ধ্যের পর কোলকাতায় কি হাওয়াই না বয়। ফুর ফুর ফুর করে প্রতি অলিতে-গলিতে কোণায়-কোণায় সে হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে সবাইকে স্নিগ্ধ করে দেয়। বিকেল থেকেই—যেই রোদ পড়ে অমনি হাওয়াটা ছাড়ে। চাতক পাখিগুলো পাশের নিমগাছটার চারদিক ঘুরে ঘুরে 'ফটিক জল—ফটিক জল' করে আকাশে নেচে বেড়ায়। অফিস-ফেরতা বাবুরা দলে দলে রাসবিহারী এ্যাভিন্যু ধরে বাড়ি ফিরতে থাকেন। তারপর সন্ধ্যে হয়ে যায়। ঘরের বাতি নিবিয়ে মা বাইরের ঘরের দরজা খুলে সিঁড়িতে বসে থাকেন। গলিটা অন্ধকার থাকে। পাশের বাড়ির মাসীমা অথবা নবনী পিসী আসেন। মার সঙ্গে সেলাইয়ের প্যাটার্ন কিংবা রান্নার পদ নিয়ে আলোচনা হয়। বাবা অফিস থেকে সোজা টেনিস খেলতে যান ময়দানে- তারপর অনেক দেরী করে ফেরেন। মা কিছুক্ষণ নিরিবিলিতে সিঁড়িতে বসে থেকে তারপর আবার সংসারের কাজে লাগেন। মার অবকাশ কম। সব সময়ই কাজ।

পথ দিয়ে কাঁধের উপর লাল শালুতে মোড়া কালো হাঁড়ি নিয়ে লোকটি হেঁকে যায়—কুলপী বরফ চাই—কুলপী বরফ।

দারুণ খেতে। বুচুসের খুব ইচ্ছে করে খেতে। কিন্তু বাবা বাইরের জিনিস খেতে মানা করেন—তাছাড়া মা না খাওয়ালে পয়সা কোথায় পাবে বুচুস?

ছোটমামা মাঝে মাঝে যখন বুচুসদের বাড়িতে এসে থাকেন তখন তিনি খাওয়ান। ছোটমামা বয়সে বড় হলে কী হয়, মনের বয়সে

এখনও ছোট, হয়ত চিরদিনই ছোট থাকবেন। উনি কচুরিপানা কী করে বাংলাদেশ থেকে চিরদিনের মত নির্মূল করা যায় তা নিয়ে গবেষণা করতেন। সারা দিন পুকুর আর বাদায় ঘুরে ঘুরে কচুরিপানার স্যাম্পল আনতেন আর মামাবাড়ির একটা ঘরে তন্ময় হয়ে গবেষণা করতেন। উনি এক অনাবিল, শিশুসুলভ জগতে বাস করতেন। তাইই ছোটমামাকে বেশ লাগে বুতুসের। ফর্সা ধবধবে—একটু বোঁচা নাক, বুকভর্তি কালো কোঁকড়া চুল—মুখে অবিরাম হাসি।

ছোটমামা যে কথাই বলুন না কেন, একবার করে ওয়ার্ল্ড বলবেন! কুল্পী বরফ খেয়ে বলবেন, ওয়ার্ল্ডের বেস্ট। মশা কামড়ালে বলবেন, ওয়ার্ল্ডের ওয়ারস্ট্। ছোটমামা খুব ভাল গল্প বলতে পারতেন। দাদুর মাইকা-মাইনের গল্প। ছোটমামার বন্ধু ছিলেন মনু মামা তিনি যে কি করে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন, কি করে ভাল্লুকের বাচ্চা চুরি করে এনে লুকিয়ে রাখতেন—তারপর কি করে সেই বাচ্চার ভাল্লুকী-মা, রাতে প্রতিহিংসা নিতে আসত, এই সব দারুণ দারুণ গল্প বলতেন ছোটমামা। এখনো চোখ বুজলেই ছোটবেলার ছোটমামার মুখে গল্প শোনা, হাজারীবাগ কোডারমার পাহাড়ে পাহাড়ে মনুমামার ঘোড়ার খুরের খটাখট খটাখট শব্দের প্রতিধ্বনি যেন কানে আসে বুতুসের।

ছোটমামা গল্প বলতেন—পেছনের মাঠে জোনাকী জ্বলত—দোতলায় শেফালিরা ঘুঙুর পায়ে গান গাইত 'নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি, আমার মন কয় চিনি চিনি'। ওদের বসবার ঘরের আলোটা খোলা দরজা দিয়ে এসে পিছনের মাঠে লম্বা হয়ে অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ত। গানের সুর, নাচের বোল, আলোর মাঠ ছড়ানো নরম ম্লানিমা এই সব মিলে মিশে বুতুসের যেদিন পড়াশুনা থাকত না—সেদিন ভীষণ, ভীষণ ভাল লাগত বুতুসের।

বুতুসের টুনুজ্যাঠাকেও মনে পড়ে। খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক। সাদা ছাড়া কোনো পোষাক পরেন নি—ফিস্ফিস্ করে কথা বলেন—হাতে সবসময় সাদা ঘড়ির ব্যাণ্ড। সময়মত খান, সময়মত ঘুমোন,

যতটুকু খাওয়া উচিত তার চেয়ে বেশী খান না। বেশী খেলে লোকে মোটা হয়, নানা রকম অসুখে পড়ে—তাই উনি বেশী কেউ খাক তাও পছন্দ করেন না। যতটুকু কথা বলার তার চেয়ে একটাও কথা বেশী বলেন না। কাউকে ধার দেন না। কারো কাছে ধার নেন না।

একবার খুব মজা হয়েছিল।

তিন্নুপিসীর বিয়ের পাকা দেখা। বুত্থসরা মেয়ে-পক্ষ। ছেলেদেব বাড়িতে মানে, তিন্নুপিসির হবুবরের বাড়িতে মেয়েদের বাড়ির সকলে পাকা দেখতে গেছেন। বুত্থসকেও সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। বুত্থস বেশ সেজেগুজে গেছে।

পাকা দেখা হয়ে গেল—এবাব সকলকে খেতে দেওয়া হল। সারি করে মেঝেতে বসিয়ে—নানা পদেব মিষ্টি—গরম গরম লুচি-ভেজে আনতে লাগল অনেকে—সঙ্গে মাংস, আনারসেব চাটনী-বেশ তোফা ভোজ।

সবাই গল্পগুজব করতে করতে খাচ্ছেন, এমন সময় তিন্নুপিসীর বাবা মানে তিন্নুপিসীর হবু শ্বশুর এসে টন্নুজ্যাঠাকে স্পেশাল খাতিব করলেন। টুনুজ্যাঠা বিলিতি ওষুধের কোম্পানীব অফিসার বলে কিনা বুত্থস জানে না—যে কারণেই হোক ভদ্রলোক এসে টুনুজ্যাঠাকে খব বেশীই খাতির করতে লাগলেন। এটা খান ওটা খান বলতে লাগলেন টাকে হাত বোলাতে বোলাতে। এমন সময় তিন্নুপিসীব হবু শাশুড়ী যিনি তিনিও এসে টুনুজ্যাঠার সঙ্গে রসিকতা করে গেলেন—বললেন, না খান ত আমার মাথা খান।

মানুষ অন্যের মাথা কি করে খায় বুত্থস জানে না। যাকগে, টুনুজ্যাঠার মুখ দেখে মনে হল জ্যাঠা বেশ চটেছেন। কেন যে চটলেন তা বুত্থস বুঝলো না—বিয়ের আগে পাকা-দেখার পর একটু ঠাট্টা-তামাসা হয়ই—তাই চটবার কি কারণ তা বড়রাও কেউ বুঝলেন না।

এমন সময় ঘটনা ঘটল।

তিন্নুপিসীর হবুশ্বশুর আবার এগিয়ে এসে টুনুজ্যাঠাকে বললেন, আপনাকে আর একটি রাজভোগ খেতেই হবে, বেয়াই মশায়।

টুনুজ্যাঠা বললেন, না, দেবেন না। প্লিজ।

উনি বললেন, না না, তা কি হয়? আপনাকে খেতেই হবে।

টুনুজ্যাঠা বললেন, দেবেন না বলছি।

বললেই শুনছি আর কি?

বলেই সে ভদ্রলোক নিজে হাতে তুলে একটি রাজভোগ টুনুজ্যাঠার পাতে দিয়ে দিলেন।

টুনুজ্যাঠা একবার চশমার ফাঁক দিয়ে ভদ্রলোকের দিকে অগ্নি-দৃষ্টিতে তাকালেন, পরক্ষণেই মুখে বললেন, ইডিয়ট্।

যাঁরা খাচ্ছিলেন—সকলে স্ট্যাচুর মত খেতে খেতে থেমে গেলেন।

কনের দাদা যদি বরের বাবাকে ইডিয়ট্ বলেন একটি রাজভোগ বেশী খেতে বলার অপরাধে—তারপরও সেখানে বিয়ে হওয়া উচিত কিনা - এ মামলা প্রকট রূপ নেবার আগেই মামলা নিষ্পত্তি হয়ে গেল—ঠিক কি করে হলো বুহুসের মনে নেই তবে ও নিয়ে আর কোনো ঝামেলা হলো না।

সেদিন বুহুসের মনে হয়েছিল যে টুনুজ্যাঠা ঠিক করেন নি।

গুরুজনদের সমালোচনা করা উচিত নয়—তবুও বুহুসের মন বলছিল যে টুনুজ্যাঠা ঠিক করেন নি। সারা জীবন সাদা জামা-কাপড় পরে সাদা ঘড়ির ব্যাণ্ড হাতে বেঁধে—নীচু গলায় ভদ্রভাবে কথা বলা সত্ত্বেও টুনুজ্যাঠার এতদিনের সংস্কৃতি-সম্পন্নতার সুনাম সেদিন টাকমাথা আন্তরিক হাসিমাখা মুখের অতিথিপরায়ণ, রাজভোগ-খাওয়ানো ভদ্রলোকের কাছে ধুয়ে গেছিল। সকলেরই চোখে টুনুজ্যাঠা অনেক ছোট হয়ে গেছিলেন সেই মুহূর্তে।

তারপর এ নিয়ে বুহুস ভেবেছে—অনেক ভেবেছে। বুহুসের মনে হয়েছে কোনো মানুষই কখনো কোনো তারের বাজনার মত এক সুরে বাঁধা থাকতে পারে না। এক সুরে বাঁধা থেকে সবসময় সুন্দর, সংস্কৃতিসম্পন্ন ভদ্র একঘেয়ে গান গাওয়ার চেয়ে, খুশীমত, বিভিন্ন সুরে গাওয়া ভাল। একজন মানুষ বিভিন্ন অনুভূতি, আনন্দ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্না, মহত্ত্ব-নীচতা সব মেশানো মানুষ। কখনো কখনো

তার ভিতরের সমস্ত বিভিন্ন সত্তারই বিভিন্ন প্রকাশ হওয়া স্বাভাবিক। সেইটাই স্বাভাবিকতা। তার ব্যতিক্রম হয়ে যারা নিজেরা একটিমাত্র সচেষ্ট সত্তাতে আবদ্ধ থেকে তাদের সেই একটিমাত্র চেহারায় প্রতিভাত হতে চান — তাঁরা বোধহয় স্বাভাবিক মানুষ নন। তাঁরা ভণ্ড।

বুদ্বুস ভণ্ড মানুষদের ঘৃণা করে। বুদ্বুস ভাবে ও কোনোদিন ভণ্ড হবে না। ওর ক্ষিদে পেলে ও খাবে, ওর দুঃখ হলে ও কাঁদবে, ওর হিংসা হলে ও হিংসা করবে, ওর দান করতে ইচ্ছে করলে ও দান করবে — অনিচ্ছায় হলেও, অন্যকে সুখী করার উপায় থাকলে অন্যকে সুখী করবে, নিজের ক্ষতি করেও। ও একটি স্বচ্ছতোয়া নদীর মত এই জীবনে বয়ে চলবে — এ জীবনটা কাটিয়ে দেবে। মেপে মেপে কথা বলবে না, দাঁত চেপে হাসবে না, বাড়িতে শান্তিনিকেতনী পর্দা টাঙিয়ে সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রতিপন্ন করতে চাইবে না নিজেকে। শরীরের ভেতরে মনের যে ঘর থাকে, সেই অন্ধকার ঘর ও হাসিতে, গানে, রাগে, অভিমানে দুঃখে আনন্দে ভরিয়ে রাখবে। প্রকৃতির ঋতু বদলের মত সে স্বচ্ছন্দ হবে, স্বাভাবিক হবে ; সত্য হবে।

বুদ্বুস শুনেছে, বুদ্বুসের আড়ালে মা বাবা আলোচনা করেছেন, ছেলেটা কিরকম বড় বড় ভাব করে — কি জানি বড় হয়ে কি হবে ?

বুদ্বুস কখনো কখনো আড়াল থেকে শুনে ফেলে আর হাসে। বুদ্বুস জানে, যে বুদ্বুস বড় হয়ে, কোনো বড় কেউ হবে না, বুদ্বুস একজন সাধারণ মানুষ হবে, সকলের মত বাসের ভিড় ঠেলে অফিস থেকে ফিরবে — রাসবিহারী এ্যাভিন্যুতে মাথা নীচু করে হাঁটবে — রবিবার থলে হাতে বাজার করবে — অন্য দশজনের গা ঘেঁষে চলবে — ঘামের গন্ধ পাবে — অথচ, তবু বুদ্বুস অন্য সকলের মত হবে না। বুদ্বুস জানে যে ও ওর নিজের মত হবে — যা ও হতে চায় — সাধারণ কিন্তু স্বতন্ত্র, জনারণ্যের একজন, কিন্তু নিতান্ত নির্জন। বুদ্বুস জানে বুদ্বুস কি হবে।

রংপুর থেকে ফিরে এমনি করে দিন কেটে যাচ্ছে একটি একটি করে। স্কুল খোলার বেশী দেরী নেই। আজ সকাল থেকে মেঘ করে আছে — জোরে জোরে হাওয়া দিচ্ছে — নিমগাছের ডালগুলো

আকাশে আরতি করছে—জানলার পর্দাগুলো পত্‌পত্‌ করে নিশানের মত উড়ছে—গলির দরজার পাশে রথের মেলা থেকে কিনে-আনা করবী গাছটার ডালগুলো ফির্‌র্‌—ফির্‌র্‌ করে দরজায় আছড়াচ্ছে। বুহুসের মন বলছে, আজ বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি হলে বুহুসের দারুণ ভাল লাগে।

মা খেয়ে-দেয়ে মধ্যের ঘরে শুয়ে থাকবেন। রত্না খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা অ-খয়েরী গুণ্ডি পান খেয়ে বাইরের ঘরে ওর বিছানা এনে শুয়ে পড়ে আরামে ঘুম লাগাবে। শেফালিদের বাড়ির বেড়াল-মা তার পুষুমুনুদের নিয়ে মিয়াঁও মিয়াঁও করে সিঁড়ি দিয়ে উঠবে নামবে। গলির পাশে নর্দমার পাশের শ্যাওলা-পড়া দেওয়ালের ডেঁও পিঁপড়েরা সারি দিয়ে ঘন ঘন যাওয়া আসা করবে। বুক ফুলিয়ে পুরুষ পায়রা বড় বড় পা ফেলে কার্নিশে ঘুরে ঘুরে ডাকবে—বুক্‌ বুকুম, গুক্‌-গুকুম্‌।

এমন সময় একটা জোর হাওয়া দেবে। প্রত্যেক বাড়িতে চটপট্‌ ঝটাপট্‌ জানলা বন্ধ করার আওয়াজ শোনা যাবে—আর বৃষ্টি এসে যাবে। বুহুস খোলা জানালার গরাদে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির গন্ধ নেবে নাকে। পীচ রাস্তায় বৃষ্টি পড়লে ধুঁয়ো ধুঁয়ো বাষ্প উঠবে—মিষ্টি মিষ্টি একটা গন্ধ বেরুবে—ট্রামগুলো গা—গা—গা করে বৃষ্টি মাথায় করে তবুও ছুটবে। বুহুস চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। পেছনের মাঠের ওপারের বাড়ির খয়েরী ডুরে শাড়ি-পরা সুন্দরী বউ তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে বারান্দা থেকে কাপড় তুলে নেবে।

তারপর বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি হবে। কতক্ষণ হবে বুহুস জানে না। বুহুস সেই জানলার গরাদে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাঁটের গন্ধ নাকে নিতে নিতে কত কী স্বপ্ন দেখবে—রংপুরের ক্যানেলের ধারের বৃষ্টির কথা মনে পড়ে যাবে—আরো কত কি কথা। তখন কাকগুলো ভিজে একসা হয়ে নিমপাতার ডালে বেচারা বেচারী মুখ করে বসে বসে ডানা ঝাড়বে আর অস্ফুটে বলবে আ—কা—কা—খা।

ভীষণ ঘেমে ঘেমে খুব পাউডার মাখা মেয়ের মুখ যেমন দেখায়—কাকগুলোকে তেমন দেখাবে। একটি ভো-কাট্টা চাঁদিয়াল ছেঁড়া-ঘুড়ি এতদিন নিমগাছটার গায়ে লটকে ছিল—হাওয়া দিলে পত্‌পতিয়ে

উড়ত—সেই ঘুড়িটি ভিজে নেতিয়ে যাবে।

দেখতে দেখতে পেছনের মাঠে জল দাঁড়িয়ে যাবে। কাল সকালে বড় বড় হলুদ ব্যাঙগুলো ঝপাং ঝপাং করে জলে লাফালাফি করবে—আশ্চর্য! ব্যাঙগুলো অন্য সময় কোথায় যে থাকে তার হদিসই পাওয়া যায় না।—অথচ জল জমলেই—কোথা থেকে ওরা এসে হাজির হয়।

আজ রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়বে—গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়া বইবে। বাবা হয়ত অফিস-ফেরতা গঙ্গার পাড় থেকে একটি ইলিশ মাছ কিনে আনবেন। মা ভাল করে বাঁধবেন—। ইলিশ মাছ ভাজাব তেল দিয়ে রাতে ভাত খেতে খুব ভালবাসে বুদ্বুস। সঙ্গে শর্ষে ইলিশ। ইলিশ মাছেব মাথা দিয়ে কচুর শাক নইলে খিচুড়ি রান্না হবে!

রত্না বলবে, রান্নাঘরে জল উঠে যাবে বুদ্বুস—তাড়াতাড়ি করে খেতে বসে যাও ও ঘরে, নইলে বার বার দৌড়াদৌড় কবতে পারি না।

বুদ্বুস মাটিতে আসন পিঁড়ি হয়ে খেতে বসে যাবে। বুদ্বুসের মাটিতে বসে খেতে খুব ভাল লাগে। গরম গরম খিচুড়ি, ঘি, আলু ভাজা, ডিম ভাজা, শুকনো লংকা ভাজা। ঈস্, কি ভালোই না লাগে। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর বৃষ্টিব একটানা ঝিরঝিরে শব্দ শুনতে শুনতে মার গায়ের সঙ্গে ইঁদুরছানার মত লেপ্টে শুয়ে থাকবে বুদ্বুস।

ট্রামটা থামতেই বুদ্বুস দেখে নিল—কোন্ কনডাক্টর দূরে আছে দরজা থেকে—ফার্স্ট ক্লাসের না সেকেণ্ড ক্লাসের। একে স্কুলের দেরী হয়ে গেছে—তার উপর ট্রামের দরজায় হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে ফুরফুরে হাওয়া খেতে খেতে দু' তিন স্টপেজ বিনা পয়সায় যেতে কার না মজা লাগে? তবে কনডাক্টর গেটের কাছে থাকলেই মুশকিল। ভাল করে দেখে উঠতে হয় কোন্ ক্লাসের কনডাক্টর গেট থেকে দূরে

আছে। ফার্স্ট ক্লাসের কনডাক্টর ভিতরে টিকিট কাটতে ব্যস্ত এবং সেকেণ্ড ক্লাসের কনডাক্টর হয়ত টিকিট কাটতে কাটতে দরজার কাছে চলে এসেছে—তাই বুতুস লাফ দিয়ে ফার্স্ট ক্লাসে উঠল—উঠে দরজায় দাঁড়াল।

এক স্টেপেজ যেতে না যেতেই ফার্স্ট ক্লাসের কনডাক্টার গেটের কাছে চলে এল—অমনি বুতুস তড়াক করে নেমে পড়ে আবার সেকেণ্ড ক্লাসের দরজায় উঠে পড়ল—ততক্ষণে সেকেণ্ড ক্লাসের কনডাক্টর টিকিট কাটতে কাটতে দরজা ছেড়ে অনেক ভিতরে চলে গেছে।

তারপর আর কি? দেখতে দেখতে স্কুল এসে গেল।

স্কুলের সামনে ভীষণ ভিড় দেখল। বাইরের কোলাপ্‌সিবল্‌ গেট বন্ধ করে উঁচু ক্লাসের পাণ্ডা পাণ্ডা ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে একজনকে বুতুস চেনে—হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় ওর পাশে সীট পড়েছিল—ও বুতুসকে বলেছিল, যন্ত্রণা বানান কি জানিস?

বুতুস ইতস্ততঃ করাতে চোখে কেমন এক ভাব ফুটিয়ে বলেছিল, চাকু চলে যাবে।

অমনি বুতুস বানানটা বলে দিয়েছিল।

আজ স্কুল স্ট্রাইক—আম্বালায় গুলি চলেছে, তাই স্কুল স্ট্রাইক। আম্বালায় গুলি চললে যন্ত্রণা বানান-না-জানা ছেলেটির এত আনন্দ হয় কেন তা বুতুস জানেনা। কিন্তু কোথাও কোনো গোলমাল হলে ওদের স্কুল হয় না।

স্কুলের সামনে মেলা বসে গেছে—টেঁপারীওয়ালা, আলুকাবলি-ওয়ালা, কেকওয়ালা আইসক্রীমওয়ালা সব বসে গেছে। ছেলেরা, পাছে টিফিনের পয়সা ফেরত নিয়ে যেতে হয়—সেই ভয়ে সকাল সকাল যা পাচ্ছে ভরপেটেই খেয়ে নিচ্ছে।

বুতুস ভাবল বাঁচা গেছে—নেসফিল্ড-এর গ্রামারের যে প্রিপজিনাস-এর চ্যাপটারটি মুখস্থ করতে দিয়েছিলেন স্যার, তা ভাল মত হয় নি। আজ স্ট্রাইক হলে ইংরিজি ক্লাস আবার সেই পরশু দিন। এর মধ্যে ও ভাল করে পড়ে নেবে।

মাকে বুতুস বলতে শুনেছে যে ওদের স্কুলটা ভাল নয়। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক বুতুসের এর চেয়ে ভাল স্কুলে পড়া হয় নি। বুতুসের কিন্তু খারাপ লাগে না। কিছু কিছু ছেলে আছে খারাপ— সে ত, সব স্কুলেই থাকে। তারা অসভ্য অসভ্য কথা বলে— মেয়েদের দেখলে বাঁদরের মত অঙ্গভঙ্গী করে—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে টিটকিরী দেয়—পড়াশুনা করে না—স্কুল পালিয়ে সিনেমায় যায়।

কিন্তু তাতে বুতুসের কি ?

বুতুসরা ফার্স্ট বেঞ্চে বসে—বুতুস, রাজা, নিমেষ, রাজু, নির্জন, রাকেশ। ওরা সকলেই প্রায় একরকম। ওরা ভাল কিনা তা বুতুস জানে না, কিন্তু ওরা অন্য অনেকের মত নয়।

রাজাটা ভারী ভাল ফুটবল খেলত—তখন থেকেই পায়ে বল পড়লে এমন ড্রিবল্ করত যে সব বলার নয়। রাজা অঙ্কে খুব ভাল ছিল। ওর বাবার অফিসেব একদিকে ছাপা কাগজের উল্টোপিঠে রাজা অঙ্ক করত। হাতের লেখাও খুব ভাল ছিল।

রাজার সঙ্গে কারো ঝগড়া হলে, যদি কেউ ওকে বলতো, "এক কাপ চা আর একটি লেড়ে বিস্কুট" অমনি রাজা ভীষণ চটে যেত। ওকে অন্য কিছু বললে ও গ্রাহ্য করত না। ব্যাপারটা কিছু নয়— তবে এক কাপ চা ও একটি লেড়ে বিস্কুট খাওয়ালেই ও ভাড়ায় খেলতে যাবে এমনি একটা কটাক্ষ।

শুনে রাজা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠত।

নিমেষটা ফর্সা রোগা মেয়ে-মেয়ে দেখতে ছিল। ভীষণ ফর্সা। দেখতেও ভারী সুন্দর ছিল। ওর ছোটবেলায় ডিপ্‌থেরিয়া হয়েছিল —তাই গলার কাছে একটি গর্ত ছিল—হাতে মাদুলী পরে আসত। পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল।

রাজু রোগা ছিপছিপে ছিল—লাল-রঙ। কিণ্ডারগার্টেনের প্যাণ্ট পরে আসত—হাত নেড়ে কথা বলত—খুব মজার ছেলে।

নির্জন চুপচাপ সিরিয়াস—মিষ্টি মিষ্টি হাসত—নির্জনও খুব ভাল ছিল।

রাকেশকেও মনে পড়ে। একমাথা চুল, মোটাসোটা গাব্দা-গোব্দা ছেলেটি—মুখে মিষ্টি হাসি—কাবুলিজুতো পরে আসত।

ওদের সকলের একটি দল ছিল—একসঙ্গে গল্প করত টিফিনের সময়—একসঙ্গে চীনাবাদাম খেত। বন্ধুদের খুব ভালোবাসত বুত্বুস। বন্ধুরাও বুত্বুসকে খুব ভালোবাসত।

বুত্বুসদের সঙ্গে সাগর দাশগুপ্ত বলে একটি ছেলে পড়ত। বয়সে ওদের চেয়ে অনেক বড়। বেঁকে বেঁকে হাঁটত—ক্লাসে এসে ইংরিজী সিনেমার গল্প করত—চালে সবসময় কাঁধ বেঁকিয়ে থাকত। পড়াশুনা কিছুই করত না। স্কুলের মাস্টারমশাইদের অনেককেই ওর বাবা প্রাইভেট টিউটর করে রেখেছিলেন। যে কোনো কারণেই হোক—সাগব প্রতিবছর ক্লাসে পড়া না করেও পাস করে যেত। ওরা খুব বড়লোক ছিল। স্কুলে আসার পথে ওদের বিরাট বড় বাড়ি পড়ত পথে। গেটে ভুঁড়িওয়ালা দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকত—রাজ-হাঁসের প্যাঁকপ্যাঁকানি শুনতে পাওয়া যেত বাইরে থেকে—কুকুরের ঘেউ-ঘেউও শোনা যেত।

একদিন স্কুলে এক মজার ব্যাপার হল। সাগরের উপর অনেকেরই রাগ ছিল। সাগরকে অপদস্থ করার জন্য যতীনের পেন্সিলটি ক্ষিতীশ, সাগরের অন্যমনস্কতার সুযোগে সাগরের জামার পকেটে ঢুকিয়ে দিল। তারপরেই 'পেন্সিল কোথায়, পেন্সিল কোথায়' বলতে বলতে যতীন কাঁদতে লাগল। ক্ষিতীশ গিয়ে ধরলে সাগরকে—বলল—চোর—এই পেন্সিল চোর। ব্যস, আর যাবে কোথায়—সকলে মিলে সাগরকে চোর চোর বলে ক্ষেপাতে লাগল। যে সাগর বড়লোক, বাড়িতে যার অনেক দাসদাসী—যে গাড়ি করে স্কুলে আসে—যে বড়লোকির গর্বে সবসময় বেঁকে থাকে—সে অসহায় পথের কুকুরের মত কোণঠাসা হয়ে গেল। ওর বিরুদ্ধে, ওদের অবস্থার বিরুদ্ধে, ওর গাড়ির বিরুদ্ধে ওর ভাল জামা-কাপড়ের বিরুদ্ধে ক্লাসসুদ্ধ ছেলের যে পুঞ্জীভূত হিংসা ও বিরূপতা ছিল—সব—সেই মুহূর্তে উল্টো-করা ডাস্টবিনের মতো ওরা সবাই ধরাধরি করে একসঙ্গে সাগরের মাথায়

. চলে দিল। সাগর রাগে, ক্ষোভে, নিরুপায়তায় একটি খাঁচা-বন্ধ বাঘের মত ফুঁসতে লাগল। তারপর ও বলল, জানিস্ আমি একসঙ্গে একহাজার পেনসিল কিনে তোদের দিতে পারি।

ক্ষিতীশ বলল, তা বললে কি হবে—চুরি ত করেছ একটা পেন্সিল।

সে দিনের পর ওরা সকলে সে ঘটনার কথা প্রায় ভুলে গেছিল।

কিছুদিন বাদে একদিন বুতুস বিকেলবেলা খেলে বাড়ি ফিরছিল। পথে যে সব খালি সিগারেটের প্যাকেট পড়ে থাকে সেগুলো কুড়োতে কুড়োতে। সিগারেটের প্যাকেট কেটে জোড়া দিয়ে একটি ব্যাগ বানাবে বুতুস—বুতুস শেফালির কাছে ব্যাগ বানানো শিখেছিল। বুতুস মুখ নীচু করে সিগারেটের প্যাকেট কুড়োতে কুড়োতে হাঁটছিল—খেলার পর ওর সমস্ত শরীর ঘেমে গেছিল—বিকেলের ফুরফুরে হাওয়া ওর গায়ে লাগছিল—বুতুসের খুব ভাল লাগছিল। হাঁটতে হাঁটতে বুতুস এসে সাগরদের বাড়ির সামনে পৌঁছল।

পথের দোকানের আলোগুলো তখন সবে জ্বলেছে। সাগরের বাড়ির সামনে দারোয়ান বসেছিল দুজন—বরাবর থাকে। গরমের সময় ওরাই জলসত্রে ভিজোন ছোলা, আখিগুড় এবং জল দেয় বাঁশের ঘরে বসে—বুতুস স্কুল-ফেরতা অনেকদিন ঐ জলসত্রে জল আর ভিজে ছোলা আখিগুড় খেয়েছে। দারোয়ানগুলোকে বুতুস চিনত। ঠিক গেটের সামনে পৌঁছতেই একটা দারোয়ান এগিয়ে এসে বুতুসের হাত ধরলো শক্ত হাতে—বুতুস ঐ সময় রাস্তা থেকে একটি গোল্ডফ্লেক সিগারেটের খালি প্যাকেট কুড়োচ্ছিল। দারোয়ান কোনো কথা না বলে বুতুসকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে সাগরদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। অন্য দারোয়ান গেট বন্ধ করে দিল।

ভিতরে যেতেই বুতুস দেখল বিরাট বাঁধানো চত্বর—তারপর বাড়ির সিঁড়ি—অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ইয়া ইয়া ভুঁড়ি-ওয়ালা তিন-চারজন ভোজপুরি দারোয়ান ওকে ঘিরে দাঁড়াল আর সাগর সামনে দাঁড়িয়েছিল একটা হলদে রঙের সিল্কের শার্ট আর নীল

রঙের প্যাণ্ট পরে। সাগরের পাশে সাগরের বোন দাঁড়িয়েছিল। নাম জানে না বুড়ুস—কারণ সাগর কোনোদিন নিজে বুড়ুসকে ওদের বাড়িতে যেতে বলেনি—বুড়ুসও যায়নি নিজে। তবে বুড়ুস সাগরের বোনের পা দেখেছে অনেকদিন, পায়ের পাতা আর হাঁটুর নীচ অবধি। সাগরদের বাড়ির গেটের নীচটা অনেকখানি ফাঁক ছিল—বুড়ুসের সমান লম্বা যে কেউ পথ দিয়ে যেতে যেতে গেটের দিকে তাকালে গেটের ওপাশে বাড়ির ভিতরে কেউ চলাফেরা করলে তাদের পা দেখতে পেত। বুড়ুস প্রায়ই রাজহাঁসেদের কমলা রঙা পা ও একটি ছোট্ট মেয়ের সুন্দর ফর্সা আলতা-পরা খালি পা দেখতে পেত—আসা যাওয়ার পথে। মাঝে মাঝে পিয়ানোর আওয়াজও শুনতে পেত—কে যেন গান গাইতেন কাননবালার গান। ঐ মালতীলতা দোলে পিয়াল তরুর কোলে।

যাই হোক শুধুমাত্র পা দেখেই বুড়ুসের সাগরের বোনের প্রতি একটি দুর্বলতা জন্মে গেছিল। ও জানত সাগরের একটি ছোট বোন আছে—অনাদিবাবু একদিন গল্প করেছিলেন উনি নাকি ওর প্রাইভেট টিউডর ছিলেন।

আজ প্রথম বুড়ুস সেই আলতাপরা সুন্দর পায়ের মালিককে দেখলো। বুড়ুসের কান গাল সব তেতে লাল হয়েছিল—অনেকক্ষণ ফুটবল খেলেছে আজ। দারোয়ান হাতটা বড় জোরে ধরেছে কিন্তু কেন ধরেছে বুড়ুস তা জানে না।

সাগর কোমরে হাত দিয়ে প্রথমে কথা বলল, বলল, তুই চুরি করেছিস।

বুড়ুস অবাক হল—বলল, না। কি বলছো তুমি?

সাগর বলল, ঠিক বলছি।

বুড়ুসের বুক ঠেলে কান্না আসতে লাগল। দারোয়ানটা ওর হাতটা মুচড়ে দিচ্ছিল।

সাগর বলল, তোমার হাতে ওটা কি?

বুড়ুসের হাতে যন্ত্রণা হচ্ছিল—ও প্যাকেটটা ফেলে দিয়ে বলল, সিগারেটের প্যাকেট। রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি। সাগর প্যাকেটটা

কুড়িয়ে নিয়ে দেখাল তার মধ্যে দুটি সিগারেট আছে। তারপর বলল, রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছ না আরো কিছু—রাস্তার লোকে গোল্ডফেক সিগারেট খায়? বাপের জন্মে গোল্ডফেক সিগারেট দেখেছ কখনো?

বুজুসের এবার প্রায় কান্না পেল—বলল, আমার বাবা সিগারেটই খান না—তুমি ভাল করে কথা বল সাগর—আমি এই প্যাকেট রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।

এমন সময় দারোয়ান ধমকে বলল, চোপ্।

সাগরের বোন খিলখিল করে হেসে উঠল—ও এতক্ষণ একটা হলদে রঙের ফ্রক পরে পেছনে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল—ও আবার হেসে উঠল—বলল, এ কি রে দাদা, এ তোর বন্ধু না কি রে? কি রকম রে? ভিতরে গেঞ্জী পরে নি—ছেঁড়া শার্ট—পায়ে চটি নেই—তোর কি রকম বন্ধু রে?

সাগর ঠোঁট উল্টে বলল, ঐ রকমই বন্ধু, চোর ত।

এতক্ষণ বুজুস ভয় পেয়েছিল। সাগরের বোনের সামনে বিনা কারণে দারোয়ানেরা ও সাগর ওকে এমন চোর চোর বলছে দেখে দুঃখিত হচ্ছিল। সেই আলতা-পরা ধবধবে পায়ের সুন্দরী মেয়েটা ওকে কি ভাবছে তাই ভাবছিল—মানে এতক্ষণ ও এমনি লজ্জিত হয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে ঐ কথাগুলো শোনার পর বুজুসের সমস্ত শরীরে কি যেন হতে লাগল। ওর ধুলোমাখা খালি-পা, ওর খাকি সাধারণ প্যান্ট, ওর গেঞ্জিহীন ডোরাকাটা ছিটের জামা এসব যে এতখানি লজ্জার তা ও আগে জানে নি, বড় বাড়ি থাকলে এবং বাড়িতে দারোয়ান থাকলেই যে রাস্তা থেকে যাকে-তাকে ধরে এনে এমন করে বলা যায়—খুশীমত চোর বানানো যায় বুজুস তা ভাবে নি কোনো দিন। এই প্রথম, বুজুসের জীবনে যে কথাটা এতদিন কেবল বইয়ের অক্ষরেই পড়েছে—সেই কথাটা ও তীব্রভাবে অনুভব করল। 'অপমান' মানে যে কি তা ও জীবনে প্রথম জানল। তার আগে দুঃখ, আনন্দ, ভয়, লজ্জা এবং অন্যান্য অনুভূতির শরিক ও হয়েছিল, কিন্তু অপমানবোধ জীবনে এই প্রথম ওর মনের অভিধানে সংযোজিত হল।

সাগরের বোন তখনো হি হি করে হাসছিল। বুদ্বুসের ছোটবেলা থেকে ধারণা ছিল বুদ্বুস খুব সুন্দর। সে ধারণা ওর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মাষ্টারমশাইয়েরা বলে বলে ওর ভিতরে জন্মে দিয়েছিলেন। শিউলিদিদিও সেরকম একটা ধারণা তার মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল। বুদ্বুস ভাবতো সে সুন্দর হোক কি না হোক—ওকে লোকে ভালবাসুক কি না বাসুক ওর মধ্যে অন্ততঃ ঘৃণা করার মত কিছু নেই। সেই সন্ধ্যেবেলায় ও সাগরদের বাড়ির বাঁধানো চত্বরে ওর বোনের হি-হি-করা হাসির ঝর্ণার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথম ওর নিজের বহিরঙ্গ রূপের দিকে চাইলো—জানলো, যে ওর গেঞ্জিহীন সস্তা ঘামে ভেজা ছিটের জামা, ওর খাকি-প্যান্ট, ওর খালি-পা ওকে ঘৃণা করার পক্ষে যথেষ্ট। ও সিগারেটের প্যাকেট পথ থেকে কুড়িয়ে অন্য লোকের ইচ্ছায় আজ চোর হয়ে গেল। দারোয়ানের গলা ধাক্কা খেল। বুদ্বুস খুব দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পারল যে ওর মধ্যে ঘৃণিত হবার মত অনেক কিছুই আছে।

সাগর বলল, ক্লাসে কে পেন্সিলটা আমার পকেটে দিয়েছিলো দেখেছিলি ?

পেন্সিলটা আসলে ক্ষিতীশ দিয়েছিল, কিন্তু কি হয়ে গেল বুদ্বুসের, বলল, আমি দিয়েছিলাম।

বুদ্বুসের মধ্যে উনুনে-বসানো দুধের মতো উষ্ণ তরল একটা প্রতিবাদ ফুলে ফুলে উঠছিল—ফুঁসে উঠছিল। দৈত্যের মত দারোয়ানগুলোর গোল গোল মুখের দিকে তাকিয়ে বুদ্বুস আবার কেটে কেটে বলল, আমিই দিয়েছিলাম।

সাগর ওর দিকে এগিয়ে এল, চোখ কুঁচকে বলল, তুই দিয়েছিলি ? বলেই ঠাস্ করে এক চড় লাগালো বুদ্বুসের গালে।

বুদ্বুস কোনো দিন কারো সঙ্গে মারামারি করেনি। কাউকে মারবার কথা মনে হলেই বুদ্বুস ভেবেছে, ঈস্ ঘুঁষিটা পাকিয়ে নাকে মুখে মারব ? নাঃ বেচারার বড্ড লাগবে—এই রকম করে ছোটবেলা থেকে আর কোনো দিন বুদ্বুসের কারো সঙ্গে মারামারি করা হয় নি।

বুতুসের চোখ বেয়ে টস্ টস্ করে জল ঝরতে লাগল। বুতুস তবু ঘাড় সোজা করে রইল। কথা বলল না। দারোয়ান তাকে বলল, এ খোঁকা একদিন তোমার জান লিয়ে লেব—দাদাবাবুর সঙ্গে কোনোদিন বদমাসী করবে ত। সাগর পরক্ষণে আর একটি চড় মারল বুতুসকে।

এবার সঙ্গে সঙ্গে এক অভাবনীয় ব্যাপার হল। সাগরের বোন দৌড়ে এল দৌড়ে এসে বুতুসকে সাগরের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে জড়িয়ে রইল—রেগে বলল, দাদা তুমি খুব অসভ্য হয়েছ—আমি বাবাকে বলে দেব। খুব বাহাদুরী না? নিজের বাড়িতে দারোয়ানদের সামনে একজনকে মারা?

সাগর ধমকে বলল, তুমি চুপ করো এষা—তোমাকে এখানে কে আসতে বলেছিল?

আমাকে কেউ আসতে বলেনি—কিন্তু তুমি এরকম করবে না।

সাগর বলল, একশবার করব—বলেই আবার হাত তুলল বুতুসকে মারার জন্যে—কিন্তু এষা বুতুসকে জড়িয়ে ধরল নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে—এবং সাগরের চড়টা এসে ওর কাঁধে পড়ল। এষা বলল, উঃ দাদা।

বুতুসের চোখ দিয়ে আরো বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগল—ও বিড় বিড় করে বলতে লাগল, ছাড়ো ছাড়ো—আমাকে ছেড়ে দাও, আমার গায়ে ঘাম—জামা নষ্ট হয়ে যাবে তোমার—।

এষার গা দিয়ে দারুণ একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছিল—এষা বলল, যাক, আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না—বোকা ছেলে —গায়ে জোর নেই—দাদার চড়ের বদলে একটা চড় মারতে পারলে না? খালি কাঁদে—কীরে—তুমি কি মেয়ে?

সাগর বলল, রঘু সিং ইস্‌কো নিকালো।

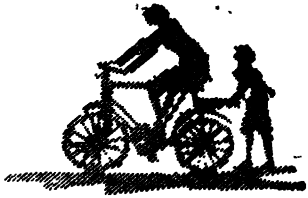
রঘু সিং বুতুসের ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে গেটটা ফাঁক করে বুতুসকে বের করে দিল এবং তারপরই আবার বন্ধ করে দিল। বুতুস পেছনে একবারও তাকালো না। মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে সোজা বাড়ি এল। নিস্তব্ধ হয়ে বাড়ি এল।

মা বললেন, বুতুস এত দেরী হল কেন? তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে পড়তে বোসো।

পড়তে বুতুস বসলো বটে কিন্তু বইয়ের পাতায় শুধু চোখ ছুঁইয়ে রাখল—মাথায় সেদিন কিছুই ঢুকলো না।

খালি গায়ে বুতুস পড়ছিল। কিছুক্ষণ পর বুতুস হেসে উঠল নিজের মনে। বুতুস নিজেকে বলল, ভিতরে কি আছে সেটা কিছুই নয়—বাইরেটাই সব—বড় বাড়ি, দারোয়ান, গাড়ি, ভাল জামা কাপড় সহ সব—একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে—এতদিন সাগর সম্বন্ধে ওদের বাড়ি, ওদের বন্ধ দরজা, ওদের দারোয়ান সমস্ত কিছু সম্বন্ধে একটা অজ্ঞানতা ছিল, একটা ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা ছিল—শ্রদ্ধাটা কেন তা বুতুস জানে না—বোধহয় ওদের যা নেই সাগরদের তা আছে বলে শ্রদ্ধা—যে কারণেই হোক—সেই অজ্ঞানতাই ভাল ছিল। আসলে আজকে সাগরের কাছে বুতুস মার খেল বটে, অপমানিত হলে বটে, কিন্তু আসলে সাগরই হেরে গেল। সেই ভয়-মিশ্রিত অজ্ঞানতার মাকড়সার জালটি ছিঁড়ে গেল। ইচ্ছে করলে বুতুস কাল স্কুলে গিয়ে ক্ষিতীশদের এ কথা বলে দিতে পারে। তাহলে সাগরকে ওরা চাঁদা করে মারবে—কিন্তু তাহলে বুতুসই হেরে যাবে। আজকে মার খেয়েও, অপমানিত হয়েও ও শেষ পর্যন্ত সাগরকে হারিয়ে দিয়ে এসেছে। এরা বুতুসের গরীব পোষাককে ঘৃণা করেছে, কিন্তু ওর ভিতরের বুতুসকে ঘৃণা করতে পারে নি। সাগর ওকে দারোয়ান দিয়ে গলা ধাক্কা দিইয়েছে, শক্ত হাতে গালে চড় মেরেছে—বাইরের বুতুসকে পীড়ন করেছে কিন্তু সাগর জানে যে ও ভিতরের বুতুসের কাছে হেরে গেছে।

সামনে বই খুলে রেখে বুতুস হাসতে হাসতে মনে মনে বলল, নাঃ ভিতরটাই সব—বাইরেটা কিছু নয়—।



শুক্রবার। দুপুরবেলা। বুতুস গলির মোড়ে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানার বারান্দায় বসে আছে। বাড়িতে মা-বাবা সব জামা কাপড় পরে বসে আছেন। বাবার এক বন্ধুর গাড়ি আসবে—মানে ড্রাইভার নিয়ে আসবে—সেই গাড়ি করে বুতুস মা-বাবার সঙ্গে সোদপুরে গান্ধীজীকে দেখতে যাবে।

কত গাড়ি আসছে যাচ্ছে রাস্তা বেয়ে—বুতুসদের বাড়ির সামনে আসছে না, কেউ। বড় বড় সেই গাড়িগুলো যাচ্ছে—স্টুডিবেকার না কি যেন নাম। মানে, বোঝা যায় না, আসছে না যাচ্ছে। রংপুরে গিরীনকাকা রসিকতা করে বলতেন, কর্তা আইতেছেন না যাইতেছেন? এই গাড়িগুলো দেখলে বুতুসেরও তাই মনে হয়—মনে হয় জিগ্যেস করে, কর্তা আইতেছেন না যাইতেছেন?

মা বুতুসকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়েছিলেন। সব পাউডার বসে বসে গলে গেল—গাড়ি তবুও এলো না। ঠাকুমার বন্ধু রঙ্গলাল জেঠুর মা বলতেন, "সেজেগুজে রইল রাই, এই লগনে বিয়া নাই।" বুতুসের সে কথা মনে পড়ে হাসি পেল। ওর-ও সেই অবস্থা।

এমন সময় একটা গাড়ি এসে বুতুসদের গলির মোড় থেকে একটু দূরে দাঁড়ালো। নিশ্চয়ই বাড়ির নম্বর ঠিক করতে পারে নি। বুতুস বসে বসেই হাত দিয়ে ডাকল—। ড্রাইভার শুনতে পেলো না। তখন বুতুস উঠে গিয়ে বলল, একটু সামনে আসতে হবে।

একজন অল্প বয়সী ফর্সা গোঁফওয়ালা বিহারী ড্রাইভার। ভুরু কুঁচকে বলল, কিঁউ?

বুতুস বলল, আমাদের বাড়ি ঐ দিকে।

সে বলল, তাজ্জব কী বাত্।

বুচুস বলল, দেরী করছেন কেন? বাবা-মা সব তৈরী হয়ে আছেন।

ড্রাইভার এবার অবাক অবাক চোখ করে বলল, কেয়া মজাকী কর রহা হ্যায় ইয়ার?

বুচুস বলল, মজা করছি না—রায়-সাহেবের বাড়ি খুঁজছেন ত? জগবন্ধুবাবুর গাড়ি ত এটা?

ড্রাইভার বলল, নেহি ভাই। জগবন্ধুবাবুকো নেহি জানতা—ই গাড়ি ত গগনমল লাড্সারিয়া কা হ্যায়। বাবু এই সামনের বাড়ির দোতলায় চ্যাটার্জী সাহেবের বাড়ি গেছেন। তুমি কেন আমার পিছে পড়েছ?

বুচুস বলল, তাই বুঝি? বলে বিরস বদনে বাড়িতে ফিরে গেল।

মা বললেন, কোথায় ছিলি?

গাড়ি দেখছিলাম।

মা বললেন, আরে আসবে আসবে, ঠিক সময় মত আসবে।

বুচুস বলল, একটা গাড়ি এল, কী সুন্দর কালো চকচকে গাড়িটা—ভাবলাম এটাই হবে--ড্রাইভার বলল না।—এখন গাড়ি এলে আর কি হবে? ওরকম সুন্দর গাড়ি ত আর হবে না।

বাবা ও ঘর থেকে বললেন, বুচুস কি বলছে?

মা বললেন, কিছু না।

বাবা বললেন, ও কি রাস্তায় যত গাড়ি দেখছে সকলকে দাঁড় করিয়ে জেরা করছে নাকি?

মা হাসলেন, বললেন, সেইরকমই দেখতে পাচ্ছি।

তারপর এক সময় গাড়ি সত্যি-সত্যিই এল। বুচুসরা সকলে মিলে সোদপুরে গেল। পথে আরো কারা যেন উঠলেন মনে নেই। সেখানে কত লোক—।

প্রার্থনা সভা হল। সেদিন গান্ধীজীর মৌনব্রত ছিল। উঁচু মঞ্চে বসে উনি চরকা কাটছিলেন। তামার মত গায়ের রঙ—চোখে চশমা—। 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' গান হল। এ গানটা বুচুসও জানে। দেখল বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি বুচুসের খুব একটা দেখার

মত মনে হল না। কিন্তু যত লোক আশে-পাশে ছিল তারা সকলে উঁহু আহা করতে লাগলেন—সেই সব দেখে শুনে বুহুসের মনে হল ওরও ভক্তি করা উচিত। দুর্গাপূজোর সময় অঞ্জলি দিতে গিয়ে লোকে যখন অঞ্জলির শেষে গড় হয়ে প্রণাম করে তখন বুহুসের প্রণাম করতে ইচ্ছে হয় না কোনো দিন। কারণ, প্রণাম করলে পূজোর নতুন নতুন গন্ধমাখা ধুতিটা নষ্ট হয়ে যাবে—অথচ সকলেই মাথা নীচু করে প্রণাম করছে—তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুহুসও করে—বুহুস ভাবে, না করলে মা দুর্গা নিশ্চয়ই চটে যাবেন। এখানেও বুহুস ভাবল, ভক্তি না করলে গান্ধীজী চটে যেতে পারেন। তাছাড়া কি দরকার? বাবা ভক্তি করছে, মা ভক্তি করছে, মাঠ সুদ্ধ লোক ভক্তি করছে; অতএব অত ভাবার দরকার কি? ভক্তি করাটাই কর্তব্য। বুহুস মনে মনে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হল।

ফেরার সময় মা বললেন, এখন ত তুমি ছোট আছ বুহুস—বড় হলে নিজেই বুঝতে পারবে গান্ধীজী কত বড় লোক। বুহুস খুশী হল। বুহুস ত সব কিছু নিজেই বুঝতে চায়—নিজে বুঝে নিলেই সব চেয়ে ভাল। তাই করবে—বড় হয়ে গান্ধীজীর কথা ভাল করে জানবে, শুনবে, বইয়ে পড়বে। কেন এত লোকে এই একজন লোককে এত ভক্তি করে সেইটা নিজের বুদ্ধিতে বুঝবে বুহুস।

বাড়ি ফিরতেই দেখল বাড়ির সামনে অনেক লোক—লোকের ভিড়।

কি ব্যাপার? কি হয়েছে? বাবা সকলকে শুধালেন।

একজন ভদ্রলোক বললেন, চাপা পড়েছেন মিলিটারী ট্রাকে।

আর একজন বললেন, বত্রিশ চাকার ট্রাকে।

বাবা বললেন, কেন?

উত্তর শোনার আগেই বুহুস শুনতে পেলো নবনী পিসী কাঁদছেন আকুল গলায়—ওরে বাবা গো, তুমি কোথায় গেলে। আমার বাবা।

পরে ঘটনাটি জানা গেল। রাসবিহারী এ্যাভিন্যু আর রসা রোডের মোড়ে উনি ছাতা হাতে রাস্তা পার হচ্ছিলেন—ট্রাকের গায়ে

ছাতাটি আটকে যায় এবং ছাতার টানে তিনি নীচে পড়ে যান—বড় বড় চাকাগুলো সব একটার পর একটা মাথার উপর দিয়ে চলে যায়—সে দৃশ্য নাকি দেখার নয়।

অনেকক্ষণ পর অনেক ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে অনেক লোক নবনী পিসীর বাবাকে কেওড়াতলায় নিয়ে গেল। গলিতে শুধু কয়েকটি খই এবং দু-একটি রজনীগন্ধা পড়ে রইল।

ফুর ফুর করে বাতাস বইছিল। বাতাসে, মাঝে মাঝে নবনী পিসীর কান্না গোঙানির মত ভেসে আসছিল। বুদুস দেখল, দুপুরবেলা যে কদবেলের খোলাটি উনি গলিতে ফেলেছিলেন সেটি তখনো পড়ে আছে। কাল সকালে কোনো হ্যাংলা কাক এসে তবলায় চাঁটি মারার মত করে সেটাতে চাঁটি মারবে—উল্‌টাবে পাল্‌টাবে—কিন্তু যে আজ এই কদবেলটি খেয়েছিল সে কালকে আর থাকবে না—ছাই হয়ে যাবে। বুদুস ভাবল আর শিউরে উঠল—ঈস্—মাথার উপর দিয়ে চাকা চলে গেল? ভাবা যায় না।

দিন-কয় আগে একদিন দুপুরবেলা একটি তিন নম্বরী ফুটবল নিয়ে বুদুস গলিতে একা-একা খেলছিল—এমন সময় দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে বলটা একবার বড় রাস্তার দিকে চলে গেল—বুদুস পেছন পেছন দৌড়ে গেল—কিন্তু বলটা ওর চেয়ে অনেক জোরে দৌড়চ্ছিল। এমন সময় বাঁদিক থেকে একটি মিলিটারী ট্রাক আসছিল—বুদুস বলটা আনতে প্রায় নেমে পড়ছিল—কিন্তু অনেক কষ্টে ফুটপাথের পাশে থমকে দাঁড়াল—ট্রাকটা হু হু করে এসে গেল—বলটাকে কে যেন তিন-চার বার চলন্ত ট্রাকটার নীচে ড্রপ খাওয়াল—তারপর একটা পটাং আওয়াজ হল এবং একটি জোড়া-চাকার নীচে বলটা চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেল। বুদুস সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গেল। বলটা তখনো গরম ছিল। বুদুসের বড় সাধের বল—। উপরের চামড়াটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে বাদামী হয়ে শম্বরের চামড়ার জুতোর মত মোলায়েম হয়ে গেছিল। এই বলটাতেই ত বাবার একশিশি পমেড মাখিয়ে কী বকুনিটাই না খেয়েছিল বুদুস বাবার কাছে। অথচ সেদিন বলটা

একটা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে গেল। বুত্থুস বলটাকে ত্বার গালে ঘষেছিল—একবার নাকে ওর পুরনো ভালবাসার বলটার গন্ধ নিয়েছিল—তারপর ছুঁড়ে পেছনের মাঠে ফেলে দিয়েছিল। তুটি ঘেয়ো কুকুর বলটা নিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কামড়াকামড়ি করা শুরু করেছিল। বলটার বদলে বুত্থুসের হৃদপিণ্ডটা কুকুর তুটোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিয়ে দিতে পারত বুত্থুস।

বুত্থুস ভেবে শিউরে উঠল যে—তার ফুটবলের মতই নবনী পিসীর বাবার মাথার উপর দিয়েও ট্রাকের চাকাগুলো চলে গেছে। ভেবেই বুত্থুসের গা শিউরে উঠল। সে রাতে বুত্থুস ভাল করে খেতে পারল না।

একদিন ভোর হতে-না হতে শেফালি এসে খবর দিল যে, ওদের বাড়ি আজ রেডিও আসবে। শেফালি বলল, তুই সেদিন আমার সঙ্গে ঝগড়া করছিলি যে বড়—রেডিও এলে তোকে শুনতে দেব না।

বুত্থুস হাসল—বলল তুই একটা গাধা—রেডিও বাজালে ত আমিও শুনতে পাব—। তাহলে বাজাসই না।

শেফালি বলল, বাজাব, কিন্তু আস্তে আস্তে বাজাব—যাতে তুই শুনতে না পাস।

বুত্থুস তবুও হাসল, বলল, না শোনালি।

বুত্থুস অত রেডিও শুনতে ভালবাসে না—একমাত্র মহালয়ার ভোর ছাড়া। সেদিন সত্যিই মনে হয় বুত্থুসের যে, বুত্থুসের বাবাও যদি একটি রেডিও কিনত তাহলে বেশ শুয়ে শুয়ে মহালয়ার চণ্ডীপাঠ, গান সব শুনতে পেত। সেদিনকার সব কিছুই আলাদা। রেডিও শোনার পর একটু ঘুমিয়ে নিয়ে উঠে তারপর সিঙ্গারা জিলিপি খাওয়া হত। এই নিয়ম বুত্থুসদের বাড়ির। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে। নিজেদের বাড়ি রেডিও না থাকলেও আশে পাশে অনেক বাড়িতে রেডিও আছে—তাই শুনতে কিছু অসুবিধা নেই। তবে সেদিন বুত্থুস বিছানা ছেড়ে জানলার তাকে গিয়ে বসে—কান পেতে সব শোনে। ঐ ওরকম তু-একটি দিন। নইলে বুত্থুসের রেডিও-টেডিও কিছুই লাগে না। জানলার তাকে বসে পেছনের মাঠে তুলো-ধুনরীওয়ালা

কেমন টুং টাং টুং টাং করে ধনুকের মত কি একটা দিয়ে সারাহুপুর তুলো ধোনে, হাওয়ায় পেঁজা মিহি তুলো লাফিয়ে লাফিয়ে এক্কা দোক্কা খেলে—বুড়ুস দেখে। কোনো কোনো দিন ভেড়ার পাল নিয়ে এসে ভেড়াওয়ালা মাঠে ভেড়াদের লোম কাটে। হাত-পা বেঁধে চিত করে শুইয়ে—ভেড়াগুলো শুয়ে শুয়ে নিজেদের কথায় কথা বলে। শালিকেরা দলবেঁধে ঘুরে ঘুরে মাঠময় কি জানি কি খুটে খায়—চড়াই পাখিরা ভুরুৎ-ভুরুৎ করে উড়ে যায় আবার নিমফুলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

কিংবা যদি দেখার মত তেমন কিছু নাও থাকে, বুড়ুস ঘাস দেখে, ঘাসফুল দেখে, হাওয়া এসে ঘাসে ঘাসে চিরুণী বুলোয় তাই দেখে, মাঠ থেকে ইঁট তুলে দেখে ঘাসগুলো মরে হলুদ গেছে—সেই চাপা-ঘাসের মধ্যে তেঁতুলে বিছের লাল লাল বাচ্চা কিল্‌বিল করে—ইঁট তুললেই তারা চতুর্দিকে দৌড়ে বেড়ায়। ফ্যাকাসে ফর্সা যাদের গায়ের রঙ—মা তাদের বলেন ইঁট-চাপা ঘাস।

বুড়ুস ঘাস ঘাসফুল ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে মনে ছোট হয়ে যায়—ছোট ছোট ছোট—গালিভারের গল্পের চেয়েও ছোট—ও যেই ক্ষুদে হয়ে যায় অমনি ওর শরীরের তুলনায় ঘাসগুলো অনেক বড় বড় হয়ে যায়—ঘাসগুলোর ভিতরের সামান্য ফাঁকগুলো বড় রাস্তার মত মনে হয়—বুড়ুস, মানে সেই ক্ষুদে বুড়ুস সেই ঘাসের বড় জঙ্গলে সারাহুপুর মনে মনে এ্যাডভেঞ্চার করে বেড়ায়। বুড়ুস সেই ঘাসে-ছাওয়া মাঠকে মনে মনে এ্যাডভেঞ্চার করে বেড়ায়। বুড়ুস সেই ঘাসে-ছাওয়া মাঠকে মনে করে নেয় কী বিরাট জঙ্গল—মাঠে জমে-থাকা এক চিলতে জলকে মনে করে নেয় বিরাট হ্রদ। বিছের বাচ্চাকে মনে করে নেয় অজগর সাপ, কটকটে ব্যাঙকে মনে করে ডাইনোসরস—ছুটির দিনে সারাহুপুর বুড়ুস মনে মনে একা একা দারুণ এ্যাডভেঞ্চার করে—মিছিমিছি ভয়াবহ ঘাসের বনে।

নাই-বা শোনাল শেফালি ওদের রেডিও। বুড়ুসের কোনো দুঃখ নেই। এই শেফালি মেয়েটা বুড়ুসের বন্ধু—কিন্তু কেবল বন্ধুই—মেয়ে মেয়ে নয়। বেশ গাঁট্টা গোঁট্টা—চটপটে কথা বলে, পড়া-শোনায়

ভাল—ঘুঙুর পরে নাচতে জানে—গানও গায়—কিন্তু ভীষণ চীৎকার করে গায়—বেলা বারোটার কাকের মত—তাই বুহুসের ভাল লাগে না। কিন্তু মেয়েটি ভাল।

ভাল হলে কি হয়—এমনি ভাল। মানে সাগরের বোন এষাকে দেখে বুহুসের যেমন পুরোপুরি মেয়ে মেয়ে লাগে, মানে বুহুস বুঝতে পারে—কথায়, বার্তায়, দাঁড়ানোয়, হাঁটায়, চোখ চাওয়ায় বুহুসের নিজের চেয়ে ও সম্পূর্ণ অন্য রকম—কিন্তু শেফালিকে দেখে তেমন মনে হয় না। মাঝে মাঝে শেফালি বুহুসকে ছ' একটা গাঁট্টা-টাট্টাও মারে—রুক্ষ চুলে ছ' বিনুনী বাঁধে—বিনুনী উড়িয়ে দৌড়ায়—শেফালির গা দিয়ে বিশ্রী ঘামের গন্ধ বেরোয়। বিজুকে যেমন লাগে, ক্ষিতীশকে যেমন ভালো লাগে, শেফালিকেও লাগে। মনে হয় শেফালিও ছেলে।

কিন্তু সেদিন এষাকে দেখে ওর অন্য রকম মনে হয়েছিল। তখন বুঝতে পারেনি; এখন পারে, যে এষাকে দেখে তার ভাল লেগেছিল। কিন্তু এষা ওকে ঘেন্না করেছিল। ওর ধুলোমাখা খালি-পা, ওর খাকি হাফ-প্যান্ট, ওর গেঞ্জী বিহীন ছিটের জামা—সব দেখে এষা নাক সিঁটকে ছিল। বুহুস ভাবে আর হাসে। জামা খুলে ফেললে বুহুসের ফর্সা গা বেরিয়ে যাবে—ফর্সা গা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলতে পারলে বুহুস দেখাতে পারত তার শরীরের ভেতরে কোথাও কোনো ময়লা নেই—খালি-পা নেই, খাকি প্যান্ট নেই—সেখানে সব এক, সব এক। অন্যের বুকে যদি ময়লা থাকে ত আছে—বুহুস জানে বুহুসের ভিতরে কোনো ময়লা নেই।

কেন জানে না, ইদানীং হঠাৎ হঠাৎ চান করতে করতে, কি ঘুম ভেঙে উঠে, আচমকা এষার কথা মনে পড়ে যায় বুহুসের। অমনি সাগরের কথাও মনে পড়ে। সাগরের টাকার গর্বে কুঁজো হয়ে যাওয়া চেহারাটাকে বুহুস ঘৃণা করে—কিন্তু সেদিন এষা সাগরের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যই হোক কি যে জন্যই হোক—এষার কথা বার বার মনে পড়ে যায় আজকাল। এষার গায়ের সেই মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা মনে

পড়ে। সাগরের চড় খেয়ে এষা 'উঃ দাদা' করে ব্যথায় চেঁচিয়েছিল। সে কথা মনে পড়ে—আসলে ঐ চডটা, বুহুসেরই প্রাপ্য ছিল।

বুহুস বাথরুমের খোলা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে বলে, বোকা বুহুস ওরে বোকা বুহুস, আবার বুঝি দারোয়ানের গলাধাক্কা খাবার ইচ্ছে হয়েছে ?

সাগরের কথা মনে হলেই রাগে বুহুসের গা জ্বলে।

এমনিই রাগ সেদিন সকালে ওর একজনের উপরে হয়েছিল। পরমেশ কাকা। বুহুসের বাবার অফিসে কাজ করেন। তিনি সকালে এসে বাইরের ঘরে বসে গল্প করছিলেন—মা ভিতরের ঘরে ছিলেন। বাবা বাড়িতে ছিলেন না, কোথায় যেন গেছিলেন।

পরমেশ কাকা বললেন, বুহুস অমৃতি খাবে ?

বুহুস বলল, হ্যাঁ খাব। বুহুস হ্যাংলা নয়, কিন্তু কেউ খাওয়াতে চাইলে কে না খেতে চায় ? তাছাড়া স্কুলে যাওয়া-আসার পথে জলযোগ মিষ্টিমুখে কত রকম মিষ্টি ত সাজানো থাকে। ও আর বিজু রোজ বলাবলি করে, যে কেউ যদি কোনোদিন ওদের অনেক টাকা দেয় তাহলে ওরা দুজনে বসে এই দুটি দোকানের কোনো দোকানে বসে শুধু মিষ্টি খাবে—যতক্ষণ না খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে যায়। পর পর পয়োধি ? ফারস্ট্ ক্লাস। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভালবাসতেন—ওরা দোকানের সামনে গলায় মালা-পরা রবীন্দ্রনাথের ছবি টানিয়ে রেখেছিলেন—আর বাণী। বিজু বলত এটা স্রেফ গুল্ না রে ?

বুহুস শুধোত, কেন ? গুল্ কেন ?

বিজু বলত, রবীন্দ্রনাথ ঐ দাঁড়ি-গোঁফ নিয়ে কখনো পয়োধি খেতে পারেন ? দাঁড়ি গোঁফে লেগে সব একাকার হয়ে যেত না তাহলে। ওঁর সময়ের কত দাম জানিস ? দাঁড়ি গোঁফ পরিষ্কার করার মত সময় কোথায় ?

বুহুস বলত, যাঃ তা না হলে ওঁরা এমনি সার্টিফিকেট টানিয়েছেন ? পয়োধি ছাড়াও অমৃতির ত তুলনা নেই। সোনালি সোনালি মচমচে, শুক্‌নো শুক্‌নো অথচ কামড়ালেই রসে টইটুম্বুর।

এই সকালে পরমেশকাকা বুতুসকে বড়ই যন্ত্রণা দিলেন। বললেন, বুতুস তোকে একসের অমৃতি খাওয়াব যদি "হারামজাদা" মানে বলতে পারিস।

বুতুস ভাবতে ভাবতে মাথা ধরিয়ে ফেলল—কিন্তু ভেবে কি হবে।, যা জানে না, তা কি ভেবে পাওয়া যায়?—যা জানে, কিন্তু ভুলে গেছে—মাথার মধ্যে কোথাও না কোথাও যা লুকিয়ে আছে—লুকোচুরি খেলছে, তাকে মনে করে খুঁজে আনা যায়—কিন্তু যে তার জানার মধ্যে আসেইনি কোনোদিন তাকে ও ভেবে ভেবে মাথা ফাটিয়ে ফেললেও ত মনে করতে পারবে না।

বুতুস ভাবল, আসলে পরমেশকাকার এ একটা খেলা—আসলে অমৃতি খাওয়াবার জন্যেই আজ সকালে উনি এসেছেন—বুতুসকে নিয়ে একটু মজা করছেন—এই পর্যন্ত।

বুতুস শেষকালে বলল, না, পারব না। আপনি বলুন কি মানে।

পরমেশকাকা খুব গর্বের হাসি হাসলেন; বললেন, হেঃ হেঃ পারলি না ত। তবে শোন। হারাম মানে শূয়োর, আর জাদা মানে বাচ্চা। তার মানে? শূয়োরের বাচ্চা। যেমন বাদশাজাদা মানে বাদশার বাচ্চা। নবাবজাদা মানে নবাবের বাচ্চা, বলেই হো হো করে খুব হাসলেন পরমেশকাকা—তারপর হঠাৎ উঠে পড়লেন, বললেন, চলি রে—তোর বাবা এলে বলিস এসেছিলুম। তারপর সিঁড়ির কাছে পৌঁছে বললেন, ভুলবি না ত? হারাম মানে শূয়োর, জাদা মানে বাচ্চা, হারামজাদা মানে শূয়োরের বাচ্চা। এই অবধি বলে পরমেশকাকা লাফিয়ে গলিতে নেমে পড়লেন—চলে যেতে লাগলেন।

বুতুস খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ ওর নাকে ভীষণ অমৃতির গন্ধ আসতে লাগল—অমৃতি খাবার এত ইচ্ছে ওর কোনোদিন হয়নি—দোকানের শো-কেসের অমৃতির থালা ওর চোখের সামনে ঘুরপাক খেতে লাগল। অমৃতিগুলো চরকিবাজীর মত বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

বুতুস একবার অপস্রিয়মাণ পরমেশকাকার হাফ শার্ট আর প্যান্টের

দিকে তাকাল। এতদিন অবধি পরমেশকাকাকে ওর ভীষণ ভাল লাগত—কিন্তু সেই মুহূর্তে পরমেশকাকাকে ওর ঘেন্না করতে লাগল—ও মনে মনে বলল, হারাম মানে শূয়োর, জাদা মানে বাচ্চা। হারামজাদা মানে শূয়োরের বাচ্চা।

পরমেশকাকা চলে গেলে বুতুস ভাবল—বুকের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখা ইচ্ছেগুলোকে লোভগুলোকে কখনো জাগাতে নেই—সেগুলোকে সব সময়ে ঘুম পাড়িয়েই রাখতে হয়—কোনো ক্রমে ভুল করে জোর করে এসে জাগিয়ে দিলে এরা কুম্ভকর্ণের মত খাই-খাই করে, তখন এদের কিছুতেই সামলানো যায় না। বুতুসের ভারী রাগ হল পরমেশ-কাকার উপর—সাগরের উপর ছাড়া এত রাগ বুতুসের কোনোদিন আর কারো উপর হয়নি। বেশ ত ছিল বুতুস, রবিবারের সকালে পড়ার টেবিলে বসে আংকল টমস কেবিন পড়ছিল আর টম কাকার দুঃখে কাঁদছিল—বেশ ত ছিল, কেন পরমেশকাকা মিছিমি ছ এসে বুতুসের সব শান্তি নষ্ট করে দিয়ে গেলেন। বুতুস ভাবল, বুতুস পরমেশকাকার মত লোকগুলোকে ভাল করে চিনে রাখবে—যারা ক্ষিদে পাওয়াতে জানে, কিন্তু খেতে দেয় না, লোভ জাগায় কিন্তু নিবৃত্ত করে না। এই লোকগুলোকে বুতুস চিনে রাখবে।

সেদিন বুতুসের মন খুব ভাল ছিল। সকালে অঙ্ক সবকটা ঠিক করেছে। Rapid Reading-এর ক্লাসে বরাবর ওকেই পড়তে হয়—ও আজও পড়েছে। স্যার বলেন, বুতুসের গলা খুব সুন্দর। ছেলেরাও তাই বলে। অত বুতুস জানে না। তবে সমস্ত ক্লাসের ছেলেরা যখন মন্ত্রমুগ্ধর মত বসে থাকে—স্যার যখন তার দিকে অনিমেষে তাকিয়ে থাকেন, তখন জোরে জোরে স্পষ্ট গলায় বই পড়ে শোনাতে বুতুসের খুব ভাল লাগে। বুতুস নিজের গলার স্বর শুনতে খুব ভালবাসে। বুতুসের মনে হয় অন্য সকলেও বাসে। নিজের নাম উচ্চারিত হলে, নিজের গলার স্বর শুনলে বোধহয় সকলেরই ভালো লাগে।

সেদিন কি কারণে স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। বুতুস বাড়ি এসে মার কাছে থেকে ছুটি নিয়ে পেছনের মাঠে ফুটবল খেলতে গেল।

মাঠের ওপাশে যে-সব বাড়ি ছিল সে-সব বাড়ির ছেলেদের নাম জানত না বুহুস, মুখ চিনত। পথে দেখা হলে 'কেমন ? ভাল ?' ইত্যাদি বলত। তারা ওখানে মেঘলা দুপুরে ফুটবল খেলছিল। বুহুস যেতেই ওরা খেলতে ডাকল এবং বুহুসও খেলতে লাগল।

বুহুসের দিকে একটি বড় ছেলে ব্যাকে খেলছিল। লম্বা, কালো মুখটা ঘোড়ার মত এবং চোখ দুটো অস্বাভাবিক। চোখ দুটো কেমন ঘোলা ঘোলা বড় বড়। ওর দিকে তাকালেই বুহুসের ভয় ভয় করত। ছেলেটি অদ্ভুত ভাবে হাঁটত। রোগা গোরুর পেটের অসুখ হলে সে যেমন চারদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে হাঁটে—ছেলেটি তেমনি করে হাত-পা ছুঁড়ে হাঁটত। ছেলেটির নাম জানত না বুহুস, তবে এটা জানত যে ওকে অনেকে টিঙ্কু বলে খ্যাপাত। টিঙ্কু ওর ডাকনাম কিনা জানে না—কিন্তু টিঙ্কু বললেই ছেলেটি খুব চটে যেত। বুহুসেব মনে হত ও আসলে চটত না, চটবার ভান করত। বয়সে ছেলেটি বুহুসের চেয়ে অনেক অনেক বড় ছিল।

বুহুসকে সেদিন গোলে খেলতে দেওয়া হয়েছিল। বুহুস কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কাকগুলো যেমন করে বারান্দায় বসে ওর ভাতের থালায় নজর দেয় তেমনি করে প্রখর চোখে বলটার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। বলটা একবার এর পায়ে লাগছিল একবার ওর পায়ে, তারপর মাঝে মাঝে বলটা দুপক্ষেরই কতগুলো ছেলের লোমগজানো পায়ের বেড়ার আড়ালে পড়ে যাওয়াতে মোটে দেখাই যাচ্ছিল না। বলটা একবার এগোচ্ছিল একবার পিছোচ্ছিল, একবার লাথি খাচ্ছিল একবার পায়ে পায়ে ড্রিবলিং-এর নরম আদর খাচ্ছিল। এমন সময় দেখতে দেখতে ওদিক থেকে একটি ছেলে তীব্র গতিতে সবাইকে কাটিয়ে বল নিয়ে বেরিয়ে এল—এল এল এল ঐ এল—ব্যাকের সেই বড় ছেলেটি আটকাতে গিয়ে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল। যে ছেলেটি বল নিয়ে আসছিল সে তির্যক গতিতে এগিয়ে এসে শট করল।

কি হল বুহুস জানে না—যে গোলে খেলে সে কি কখনো বুদ্ধি খাটাবার সময় পায় ? সে বলের দিকে চুম্বকের মতই এগিয়ে যায়—

বুদ্বুস রংপুরে ক্যানেলের মাছের মত লাফিয়ে উঠে বলটা পাঞ্চ করল—সাঁ করে বলটা বেরিয়ে গেল অনেক উঁচু দিয়ে। গোল হল না। ব্যাকে যে ছেলেটি খেলছিল সে তখন চিৎপটাং অবস্থা থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে এগিয়ে এসে বলল, বাঃ বাঃ, চমৎকার।

বুদ্বুসের আসলে খুব আনন্দ হয়েছিল। আজ স্কুল থেকে এসে মনটা এমনিতেই ভাল ছিল তার উপর এমন গোলটা বাঁচাল—বুদ্বুস আনন্দে দুপুরবেলার পাঁঠার মত গব্ গব্ করে হেসে উঠল। ছেলেটি আবার বলল, বাঃ বাঃ।

কি হয়ে গেল বুদ্বুস জানে না—ছেলেটির হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুদ্বুসের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: টিঙ্কু। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বড় ও লম্বা ছেলেটি জোরে এক ঘুষি মারল বুদ্বুসর কপালের রগের উপর।

এত বড় হয়েছে বুদ্বুস কোনোদিন কাউকে মারেনি আর এমন মার যাকে বলে তা কখনো খায়নি আগে। বুদ্বুস মাথা ঘুরে পড়ে গেল মাঠের মধ্যে। চারদিকের বাড়িগুলো শূন্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। কারা যেন দৌড়ে এল; শুনল, যেন বলছে, চল্ বাড়ি পৌঁছে দিই।

বুদ্বুস মুখে কথা বলল না। বলতে পারলও না। হাত দিয়ে মানা করল। তারপর কোনোরকমে টলতে টলতে উঠে দেওয়ালের পাশে বসে রইল। অনেকক্ষণ বসে রইল। কতক্ষণ খেলা হল, কারা হারল কারা জিতল তা বুদ্বুস জানলও না। বুদ্বুসের মাথার মধ্যে একসঙ্গে অনেক অনেক কাক ডাকতে লাগল—বুদ্বুস তাদের লাল লাল টনসিল দেখতে পেল।

খেলা তখনো শেষ হয়নি। বুদ্বুস কোনোরকমে টলতে টলতে পথের পাশের পাঁচিলে বারান্দায় হাত রেখে রেখে বাড়ি পৌঁছে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কখন চাতক পাখিগুলো 'ফটিক জল, ফটিক জল' করে নেচে নেচে চলে গেল বুদ্বুস জানে না। কখন বাড়ি বাড়ি সন্ধ্যের শাঁখ বাজল

তাও জানে না—মা কখন গা ধুয়ে এলেন বুত্নস তাও জানে না। বুত্নস বাড়ি এসেই ঘুমিয়ে পড়ে ছিল।

মা ডাকলেন, বুত্নস।

উঃ।

কি হল? অসময়ে শুয়ে কেন?

বুত্নস আবার বলল, উঁ?

মা এগিয়ে এলেন, বুত্নসের গলায় হাত দিয়ে দেখলেন, বললেন, ওকি গায়ে ত বেশ জ্বর।.

কি করে হল?

বুত্নস বলল, মাথায় ব্যথা।

মাথায় কি হয়েছে?

বুত্নস জানে মিথ্যা কথা বলা উচিত না—বুত্নস বললেও না—কিন্তু মরে গেলেও বুত্নস মাকে বলতে পারবে না যে বুত্নস রাস্তায় কি মাঠে মারামারি করে এসেছে। মারামারি ত করেনি—মার খেয়েছে। মার খেলেও দোষ—কারণ মা বলবেন, অন্যায় না করলে মার খাবে কেন?

বুত্নস বলল, বলে হেড দিতে গেছিলাম—বলের লেসটা ভাল করে ঢোকানো ছিলো না—টিপি পাকানো ছিল—সেটা মাথায় লেগেছে।

মা ঘরের আলো জ্বালিয়ে, বিছানায় বুত্নসের পাশে এসে বসলেন। মার ঠাণ্ডা, সাবান-পাউডারের গন্ধ-মাখা গায়ের পাশে শুয়ে বুত্নসের মনে হল ওর মাথা ব্যথা এক্ষুনি সেরে যাবে। মা বুত্নসের গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

বুত্নস শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল—কেন এমন ঘটনাটা ঘটল? বুত্নস এবং সেই ছেলেটি দুজনে কিন্তু সে মুহূর্তে খুশী ছিল। একজন প্রশংসার কাজ করেছিল, অন্যজন সে জন্যে তাকে প্রশংসা করছিল—এই সময় কেন ও টিঙ্কু বলতে গেল? টিঙ্কু মানে যে কি তাও বুত্নস জানে না। ঐ নামে বুত্নসের সামনে ঐ ছেলেটিকে অনেকে ক্ষেপিয়েছে—কিন্তু ছেলেটি কাউকে মারা দূরে থাকুক, রাগ পর্যন্ত করেনি। আসলে খুশী হয়েছে, কিন্তু বাইরে রাগ দেখিয়েছে।

কিন্তু সে যাই হোক—ছেলেটি বুড়ুসকে মেরে অন্যায় করেছে। এমন জায়গায় মেরেছে যে বুড়ুস মরেও যেতে পারত—ব্যথায় বুড়ুসের জ্বর হয়ে গেছে। কিন্তু বুড়ুস কি করতে পারত? ওকে উল্টে মারতে পারত? না। বুড়ুসের গায়ে সে জোর কোথায়? তাছাড়া ও ত বুড়ুসের চেয়ে কত বড়। তাছাড়া জোর থাকলেই বা কি বুড়ুস মারতে পারত? বোধ হয় না। বুড়ুস অক্ষর চেনার পর থেকে মা বলেছেন, কখনো মারামারি করবে না—ভদ্রলোকেরা মারামারি করে না।

বুড়ুস ভাবছিল শুয়ে শুয়ে, ভদ্রলোকেবা মারামারি না করলে যদি ভদ্রলোকেরা মার খায় তাহলেও কি মারামারি করবে না?

কয়েকদিন আগে বুড়ুস হোমিওপ্যাথী ডাক্তারখানার রকে বিকেলে বসে দেখছিল রাস্তার কলে জল নিয়ে ঝগড়া লেগেছে। একজন মুটে, একজন মুসলমান দর্জি এবং তুজন ষণ্ডা ষণ্ডা লোক। কাছাকাছি কোনো বাড়িতে রান্নাবান্নার কাজ করে বোধ হয় তুটি মেয়ে; তারা কলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে একটি মেয়ে মিনমিনে গলায় কি বলছে। সেই মেয়েটি কিন্তু কলে সেকেণ্ড ছিল—তা দেখেছে বুড়ুস; কিন্তু ঐ মুটে ও অন্যান্যরা এসে ওর কলসী ঠেলে সরিয়ে দিল। ওরা নাকি সিনেমা দেখতে যাবে, তাই তাড়াতাড়ি চান করতে হবে।

মেয়েটি আবার মিনমিনে গলায় বলল। একটু ভরতে দ্যাও না গো—বাড়িতে বাচ্চাটার মা বস্তে আছে। বাচ্চাটার জ্বর।

বলতে বলতে রাস্তার উল্টোদিকের বাড়ির সেই ফর্সা রোগামত ভদ্রলোক—(বুড়ুস নাম জানে না। এজি বেঙ্গল অফিস না কি কোন্ অফিসে কাজ করেন)—বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন কলের কাছে। গায়ে গেঞ্জী ধুতি পরা।

বললেন, সরলা কি হল? এখনো জল আনলে না? মিনু যে জল জল করে অস্থির হল। জ্বর উঠেছে কত আর মুখে দেবার মত জলও নেই ঘরে।

মেয়েটি বলল, কি করব বাবু? এনারা দেচ্ছেন না।

দ্রলোক এগিয়ে গিয়ে লোকগুলোকে ভাল ভাবে বললেন— ভাই বাড়িতে অসুখ, ওকে একটু জলটা তাড়াতাড়ি ভরতে দাও।

কুলকাচ করতে করতে ওদের মধ্যে একজন কি যেন বলে উঠলো। মেয়েটি ওখান থেকে সরে এল ভীষণ রাগ রাগ মুখ করে আর ভদ্রলোক কি যে অসহায় মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন—তা বলার নয়। ভদ্রলোকের হাত দুটো খুব সরু সরু ফর্সা ফর্সা।

বুদ্বুস ভাবল, উনিও বোধ হয় ছোটবেলায় বুদ্বুসের মত কবিতা লিখতেন। বুদ্বুস কিছুক্ষণ দেখল, দেখে খুব রাগ হল। বুদ্বুস ভাবল, ওর গায়ে জোর থাকলে ঐ লোকগুলোকে শায়েস্তা করে দিত। কিন্তু বুদ্বুস বড় জোর ওদের কাছে গিয়ে ইংরেজীতে আঙুল নেড়ে বলতে পারে, This is awfully bad.

awfully কথাটা ভূগোলের স্যারের কাছে বুদ্বুস নতুন শিখেছে। মাও জানে। কিন্তু awfully bad বলাতে ত এই অন্যায়ের কোন সুরাহা হবে না। এ অন্যায়ের একটিই ওষুধ। সেজকাকু আজকে থাকলে সে ওষুধ আজ দিতে পারত। কোমরে কাপড়টি গুঁজে নিয়ে ওদের সামনে গিয়ে একবার ভাল করে বলত। তাতেও যদি ফল না হত তাহলে দু হাতে সমানে এক সঙ্গে ঘুষি চলত। মুহূর্তের মধ্যে সব ভোঁ ভাঁ।

সত্যি সত্যিই বুদ্বুসের মনে হল, মা যা বলেন তা বোধ হয় ঠিক না। নিরুপায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদেরও গায়ে জোর থাকা দরকার। নইলে যাদের গায়ের জোর ছাড়া আর কিছুই নেই তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না। বুদ্বুস মহাভারতে রামায়ণে পড়েছে ত। যেমন যেমন তীর শত্রুপক্ষ ছুঁড়বে—তেমন তেমন তীর আবার ছুঁড়তে হবে সে তীর কাটবার জন্যে। যে অন্যায় করছে তার সমান হয়ে কিছুক্ষণের জন্যে নীচে নেমে এলে কি তার মহত্ত্ব নষ্ট হয়ে যাবে? জানে না। বুদ্বুস শুধু ভাবে।

তবে ঐ ছেলেটিকে, যে তাকে ঘুষি মেরেছিল, বুদ্বুসের মারা উচিত ছিল। তার গায়ে জোর নেই বলে সে মারতে পারল না। এবার

থেকে বুতুস শুধু কবিতা লিখবে না—ডন-বৈঠক বারবেল্-মুগুর এসব করবে। নইলে, যারা ওর কবিতা-টবিতা কোনোদিন বুঝবে না—যাদের মগজে ঢুকবে না—তারা ওকে বরাবর গায়ের জোরে হারিয়েই যাবে। বুতুস জানে কবিতারও জোর আছে—আবার হাতেরও জোর আছে। কোনো জোরই হেলা করার নয়—মা যাই বলুন। এবার থেকে বুতুস এক্সারসাইজ করবে।

বাবা ফিরেই বললেন, কি হল? বুতুসের কি হল?

মা বললেন, বলে হেড দিতে গিয়ে মাথায় লেগেছে।

বাবা বললেন, সাবাস ফুটবলার। তারপর এগিয়ে এসে মাথায় হাত দিয়ে যেখানটা ফুলেছিল সেখানে আঙুল বুলোলেন। বুতুস উঃ করে উঠলো।

বাবা বললেন, হেড দিতে গিয়ে এখানে কি করে লাগল? আশ্চর্য।

ভয়ে বুতুসের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। বুতুস ভুলেই গেছিল যে বাবা খুব ভাল ফুটবল খেলতেন। বুতুস চুপ করে রইল। মুখে একবার বলল, উঃ।

তারপর বাবা আর কিছু বললেন না।

বাবা অফিস থেকে ফিরেই মাকে বললেন, একটা খবর আছে।

কি খবর? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু হয়েছে।

বাবা বললেন, হয়েছে মানে ট্রান্সফার অর্ডার। এতদিন অনেক ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলাম—আর হলো না। এবার যেতেই হবে।

মা সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, কোথায়?

কোথায় আর? যেখানে হওয়ার কথা চলছিল। বরিশাল।

বাবা বললেন।

সে কি? সে যে অনেকদূর। তাছাড়া শুনেছি খুব নদীনালার জায়গা। আমরা বাবা ছোটবেলা থেকে পশ্চিমে মানুষ। নদী-নালা-সাপ-কোপ ভাল লাগে না। রংপুরই ভাল লাগে না। তার বরিশাল।

বাবা হাসলেন, বললেন, রংপুর ভাল লাগে না তার কারণ আছে—কারণ সেটা আমাদের দেশ।

মা বললেন, হ্যাঁ। তুমি ত তা বলবেই।

তারপর মা বললেন, সত্যিই যেতে হবে?

সত্যিই। বাবা বললেন।

বুড়্হুসের স্কুল কি হবে? মাঝে মাঝেই রংপুরে যাওয়ায় ত অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আবার এই বরিশাল যাবে। ছেলেটার পড়াশোনার বড়ই ক্ষতি হচ্ছে।

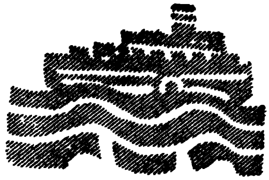
বাবা বললেন, কি করা যাবে? জাপানী বোমা আর সরকারী চাকরী।

তারপর বললেন, এ সব আলোচনা এখন থাক—ডাক্তারবাবুকে ডেকেছিলে?

মা হাসলেন, হ্যাঁ এমন কিছু হয় নি যে এতেই ডাক্তার ডাকতে হবে। কিরে বুড়্হুস? কেমন লাগছে? ভালই লাগছে। কি বল? একটু আগে মাথায় অগুরু দিয়ে জলপটি দিয়েছি।

তারপর আরো অনেক কথা হল—বাবা কি বললেন বুড়্হুস আর শুনল না—বুড়্হুসের মনটা প্রজাপতির মত আবার উড়তে লাগল। বরিশাল,—বাখরগঞ্জ সাবডিভিসান—। ক্যালকেশিয়ান বুড়্হুস কোনো দিন ষ্টীমারে চড়ে নি। বুড়্হুস মার কাছে শুনেছে বরিশাল যেতে হলে খুলনা থেকে ষ্টীমারে যেতে হয়।

নতুন জায়গা, নতুন নদী, নতুন মাঠ, নতুন গাছপালা, নতুন রোদ, নতুন বৃষ্টি। উঃ ভাবা যায় না। বুড়্হুসের মনটা আনন্দে নেচে উঠল।



সেই যে এষা বুহুসের জামা-কাপড় আর খালি পা দেখে নাক সিঁটকেছিল তখন থেকে বুহুসের একটা অসুখ হয়ে গেছে। সে অসুখটা আর কিছু না। হীনমন্যতা। বড় লোক দেখলে, সুন্দর বাড়ি দেখলে, বুহুস কেমন কুকঁড়ে যায়। কুণ্ঠিত হয়ে থাকে।

খেলতে গেলে বুহুস খালি পায়েই যায়, কারণ বুহুসের একটিই নটীবয় সু। বাটা কোম্পানীর। বুহুস যখন আরো ছোট ছিল তখন বুহুস পথে আসতে-যেতে ইঁট পাথর ডাবের খোলা যা পেত তাতেই লাথি মারতে মারতে যাওয়া-আসা করত। ভাবত জুতো তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে গেলে হয়ত আবার জুতো পাবে। কিন্তু বুহুসের পা ছিঁড়ে যেত, নটীবয় সু ছিঁড়ত না। এখন অবশ্য বুহুস বড় হয়েছে। যত্ন করে জুতো পরে। ও জানে, ছিঁড়লে বাবার আবার ত কিনে দিতে হবে। চটি একটা বানিয়েছিল বুহুস—ব্লেড দিয়ে পুরোনো সুএর দুটি পাশ কেটে ফেলে। —বেশ ফটাং ফটাং করে তা পরে ও ঘুরেও বেড়াত—কিন্তু একদিন চটিজোড়া বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়াতে ও বাইরের গলিতে রেখে শুকোতে দিয়েছিল এমন সময় একটা সাদা নেড়ি কুকুর দৌড়ে এসে একপাটি চটি মুখে করে পালিয়ে গেল। তারপর সেই কুকুর এবং চটি দুই-ই বুহুস দেখতে পায়নি আর।

অরুদের বাড়ি গেছিল বুহুস। মাঝে মাঝে যেদিন লেকের মাঠে খেলা থাকত—ম্যাচ বা অন্য কিছু, সেদিন যেত। অরু ওদের স্কুলে পড়ত না—সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়ত। দারুণ ভালো ছিল অরু, পড়াশোনায় এবং ব্যবহারে। লেকে খেলতে গেলেই খেলার শেষে অরু বুহুসকে ওদের বাড়ি নিয়ে যেত। বুহুসের অস্বস্তি লাগত। অরুরা খুব বড়লোক ছিল। চারতলা উঁচু বাড়ি—প্রত্যেক ঘরে

মোজাক্ না কি বলে তাই করা। খালি পায়ে হাঁটলে পায়ের নীচে সুড়সুড়ি লাগে—জুতো পরে হাঁটতে গেলে ত নিশ্চয়ই পা পিছলে পড়ে যাবে। বুতুসের ধূলো পায়ে অরুদের বাড়ির সুন্দর মেঝেতে হাঁটতে সংকোচ লাগত।

অরুব নিজেরই তুটি ঘর ছিল। একটি শোবার ও অন্যটি পড়ার। তুটি ঘরই সুন্দব করে সাজানো। বুতুস ভাবত ওর নিজের যদি এমন একটা জানলা ঘেরা সুন্দর ঘর থাকত তেতলা বাড়িব উপর, ও তাহলে নিশ্চয়ই সব সময় কবিতা লিখত। বুতুস ভাবত ও বড় হয়ে কবি হবে, লেখক হবে। ওব মনে কত কি কথা সব সময় সজনেফুলের মত ফুটে থাকে—হাওয়ায় হাওয়ায় তারা সব ঝরে যায়—হারিয়ে যায়। ওর খুব লিখতে ইচ্ছে কবে। ঝরে যাওয়ার আগে সব কিছু লিখে রাখতে।

বুতুস ভাবে আশ্চর্য, ও স্কুলে যাচ্ছে, পড়াশুনা করছে, অথচ ও কি হবে ও জানে না? বুতুসের খুব জানতে ইচ্ছে করে অন্য ছেলেরা কে কি হবে তা ওরা জানে কিনা? মাঝে মাঝে বুতুসের বাবা জিজ্ঞেস করেন, বুতুস তোমার ক হতে ইচ্ছে কবে? ডাক্তার না ইঞ্জিনীয়ার? বুতুস মুখ নীচু কবে হাসে। বলে, জানি না। আমি কি হব জানি না।

বুতুস মুখ ফুটে আর বলে না যে, আমি লেখক হব—বুতুস যাই হোক না—এই সত্তাই বুতুসের আসল সত্তা হবে—এ কথা বুতুস মনে মনে জানে। কিন্তু বাবা যদি বকেন।

অরু বলে, আমি কিছুই হব না, জাস্ট মানুষ হব—মানুষের মত মানুষ।

বুতুস ভাবে এ ছেলেটা অদ্ভুত—যেমন সব সময় এক গাল হাসে তেমন মজার মজার কথা। লেকের মাঠে ঐ যে সাদা বাছুরটি চরছিল ও-ও ত গোরুর বাচ্চা—বুতুস ভাবল আচ্ছা ও-ও কি ঘাস খেতে খেতে ভাবছে এখন, যে আমি কিছুই হব না—গোরু হব—গোরুর মত গোরু হব? ধ্যুৎ এসব ভাবনা ভেবে ভেবে শেষ নেই।

অরুরা কিন্তু অন্যরকম বড়লোক। সাগরদের মত নয়। সাগরদের বাড়ির কেউই কোনো কাজ করে না। সকলেই বসে বসে থাকে।

ফর্সা ভুঁড়ির উপর গেঞ্জী গুটিয়ে আস্তে আস্তে হুলো বেড়ালের মত হাই তোলে—সকাল বিকেল গাড়ি চড়ে বেড়ায়—ওদের দেখে বুহুসের কেমন ময়দার তৈরী মানুষ মনে হয়—ওদের শরীরে কি মনে কোথাও কোনো ঋজুতা নেই—সোজা হয়ে বুক টান করে দাঁড়ায় না, সোজা ভাবে কথা বলে না। কেমন যেন। সাগর অবশ্য ব্যতিক্রম। টাকার গর্বে ও ধনুষ্টংকারের রোগীর মত বেঁকে গেছে ; বেঁকে রয়েছে।

অরুদের বাড়ি সকলেই কাজ করেন। ওর জ্যাঠামশাই হাই-কোর্টের জজসাহেব, বাবা যেন কোথায় কি বড় কাজ করেন। গাড়ি করে অফিস যান—সব সময় হাসিখুশী। অরুর মা ও জ্যেঠিমাও খুব ভাল। বুহুস গেলেই ঠাণ্ডা মেসিন থেকে বের করে কত কি খাবার দেন। অরুর মা আর বাবার খুব ভাব। যেন ভাই বোন। সব সময় হাসেন, রসিকতা করেন।

একদিন বুহুস একটা জিনিস দেখে ফেলেছিল—সেদিন রবিবার দুপুরবেলায় বুহুস অরুদের বাড়ি গেছিল—অরু বলেছিল যেতে—মেকানো বানাবে বলে। অরুর ঘরে যেতে হলে অরুর মা-বাবার ঘর পেরিয়ে যেতে হয়। সে ঘরের পাশে পৌঁছতেই বুহুস অরুর মার খুব মিষ্টি হাসির শব্দ শুনতে পেল—কিন্তু চাপা হাসি। তারপরই অরুর বাবা বললেন, আমার মংকু, মংকু সোনা।

অরুর মা বললেন, ভালো হবে না বলছি—ছাড়ো।

এই অবধি শুনেই বুহুসের বুকটা কৈ মাছের কান্‌কোর মত হাঁকু-পাঁকু করতে লাগল—কান গরম হয়ে গেল। বুহুস ভাবল, এক দৌড়ে বারান্দা পেরিয়ে অরুর ঘরে চলে যায়। বুহুস দৌড়ে যেতে যেতে দেখতে পেল অরুর মা একটা ডুরে শাড়ি পরে সুন্দর স্প্রিংয়ের খাটে চুল ছড়িয়ে শুয়ে আছেন—কোলবালিশটা পাশে রাখা আছে--আর অরুর বাবা পায়জামা আর হাতওয়ালা গেঞ্জী পরে কোলবালিশ পেরিয়ে অরুর মাকে চুমু খাচ্ছেন।

বুহুসের বুকটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল। দৌড়ে কোনোরকমে অরুর ঘরে ঢুকলো। দেখল, অরু জানলার পাশে বসে আছে।

বুহুসকে দেখে অরু বলল, কি হল? অমন করছ কেন?

বুহুস বলল, বাইরে বড় রোদ।

অরু বলল, আমি ত তাই দেখছিলাম।

কি দেখছিলে?

পীচের রাস্তার মরীচিকা দূরে রূপোর পাতের মত জ্বলে ওঠে। নিভে যায়। বেশ লাগে দেখতে। আমার একটা Book of Knowledge আছে তাতে মরীচিকার কথা খুব সুন্দর করে লেখা আছে।

বুহুস নিশ্বাস নিয়ে বলল, আমায় একবার পড়তে দেবে?

অরু বলল, হ্যাঁ। আমার পড়ার ঘরেই আছে। ওখানে তুমি যে কোনাদিন পড়ো। মা, বই কাউকে বাড়ি নিয়ে যেতে দিতে বারণ করেন, বলেন বই বাড়ির বাইরে যাওয়া মানে সরস্বতী বিদেয় করা।

বুহুস বলল, ঠিক আছে। এখানেই পড়ব একদিন। তারপর বলল, 'মেকানো' বানাবে না?

মেকানো বানাতে বুহুসের দারুণ লাগে। ঈস্ ওর যদি এরকম মেকানো থাকত—সবগুলো। তাহলে সারা দুপুর ও মেকানো বানাত, তাহলে আর চড়াই পাখিদের ধুলোয় চান করা দেখত না।

অরু বলল, আজ মেকানো থাক্। আজ ক্যারাম খেলি চল।

অরু ক্যারাম বোর্ড বের করল, তারপর কোথা থেকে যেন পাউডারের কৌটো এনে বোর্ডে পাউডার ছিটোল। ফ্যানের হাওয়ায় চারদিকে পাউডার উড়ল—নাকে মিষ্টি মিষ্টি একটা গন্ধ এল—এটা অন্য গন্ধ—মা যে পাউডার মাখেন সে পাউডার না। বুহুস যখনি অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে মার কথা ভাবে—নাকে ঐ পাউডারের গন্ধও পায়—মার সাবানের গন্ধও। আচ্ছা, স্বপ্নের মধ্যেও পাউডারের গন্ধ কি করে পায় বুহুস? ঐ গন্ধ নাকে গেলেই বুহুসের মার কথা মনে হয়।

পাউডারের গন্ধ নাকে যেতেই বুহুসের সেই কথা মনে হল। অরুর বাবা কি তাহলে অরুর মাকে পাউডার মাখিয়ে চুমু খাচ্ছিলেন? ঈস্ ভাবা যায় না। বড়রাও চুমু খায়? হঠাৎ বুহুসের মনে হল তাহলে বুহুসের বাবাও বুহুসের মাকে চুমু খায় নিশ্চয়ই। আর মার

গা দিয়ে সব সময় যা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরোয়—মার গাটা কি মোলায়েম, কি ঠাণ্ডা, বুতুসের বাবা তাহলে নিশ্চয়ই মাকে চুমু খান। ঈস্ কি অসভ্য। বাবাকে নিয়ে চলে না। বেশ খারাপ লাগছে।

ওরা দুজনে ক্যারাম খেলছিল। ক্যারাম বুতুস ভাল খেলতে পারে না। বুতুসের বাবা ঘরে-বসে কোনো কিছু খেলা পছন্দ করেন না। তাই বুতুস এসব খেলেও না। তাস টাস খেলা ত জানেই না।

খেলতে খেলতে বেশ অনেকক্ষণ হয়ে গেল।

অরুর মার গলা শোনা গেল। উনি অরুকে আর বুতুসকে খেতে ডাকলেন।

ওদের আলাদা খাবার ঘর আছে—তাতে টেবল চেয়ার পাতা—দেওয়ালে সুন্দর ছবি। সবই সুন্দর। অরুর মা নানারকম খাবার দিলেন সুন্দর প্লেটে সাজিয়ে—তারপর দুধ দিলেন। ঠাণ্ডা মেসিনটা খুললেন, বন্ধ করলেন।

ঐ মেসিনটার দিকে বুতুস এ ঘরে এলেই তাকিয়ে থাকে। সাদা রঙ। উপরে ইংরিজীতে লেখা Frigidaire। দরজা খুললেই ভিতরে আলো জ্বলে ওঠে—ধুঁয়ো বেরোয়—কিরকম একটা গন্ধ আসে—। বুতুসের খুব ইচ্ছে করে ফুটবল-ম্যাচ খেলার পর—শরীর যখন আগুনের মত গরম হয়ে থাকবে—তখন দৌড়ে এসে একদিন এই মেসিনের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে যাবে। তারপর কেমন লাগে দেখবে।

আজকে অরুর মাকে দেখে বুতুসের লজ্জা করছিল। অরুর বাবা টেবলে বসেছিলেন। চায়ের কাপ নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে উনি কথা বলছিলেন। বুতুসদের সঙ্গে; অরুর মার সঙ্গে। আশ্চর্য! কে বলবে যে একটু আগে উনি 'মংকু সোনা', 'মংকু সোনা' বলে অরুর মাকে চুমু খাচ্ছিলেন।

ওরা চা খাচ্ছে এমন সময় এক কাণ্ড হল। বুতুস দেখল, হঠাৎ এষা এসে ওদের খাবার ঘরে ঢুকলো, বলল, মাসী আমি এসেছি।

বুতুস জানত না যে অরুদের সঙ্গে সাগরদের কোনোরকম সম্পর্ক আছে। এষাকে দেখে ওর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এমনিতেই ও

আস্তে আস্তে খাচ্ছিল। কারণ ও জানে যে অন্য লোকের বাড়ি গিয়ে ভদ্রভাবে খেতে হয়। আস্তে আস্তে। ও খাচ্ছিলও আস্তে আস্তে।

কিন্তু যেদিনই অরুদের বাড়িতে যেত, বাড়িতে বানানো অত অত ভাল খাবার একসঙ্গে দেখে ও অবাক হত এবং একটু উত্তেজিতও হত। সে উত্তেজনা ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠত—তা বুড়ুস জানে—বুড়ুস বুঝতে পারে,—বুঝতে পারত বলেই বুড়ুস আরো লজ্জা পেত—ভাবত এ মাঃ অরুর মা ভাববেন, আমি হ্যাংলা, আমি অসভ্য। অরুর মা কিন্তু বার বার বলতেন, তুমি কিছুই খাচ্ছো না বুড়ুস—আর একটা চপ্ নাও—আর একটা মিষ্টি নাও। বুড়ুসের তাতে আরো কান লাল হয়ে যেত। এত ভাল ভাল জলখাবার খেতে বুড়ুস অভ্যস্ত নয়।—তাছাড়া অরুদের সব কিছু বুড়ুসদের থেকে অন্যরকম—তাই সেই সব মুহূর্তে সেই পুরানো হীনমন্যতাটা নতুন করে বুড়ুসের ঘাড়ে সিন্ধবাদ নাবিকের মত চেপে বসত।

তার উপর এষা এল। সব—সব মনে পড়ে গেল বুড়ুসের। সাগরের চড় মারা, বুড়ুসের খালি পা—চোর আখ্যা পাওয়া। বুড়ুসের আবার কান্না পেয়ে গেল সেই মুহূর্তে। ও ত জানতো না যে এষারা অরুর আত্মীয়। সেই মুহূর্তে বুড়ুসের মনে হল ও দৌড়ে টেবল ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, ভাল খাবার ছেড়ে পালিয়ে যায়—এষাকে ছেড়ে অরুকে ছেড়ে পালিয়ে যায়—এক দৌড়ে বাড়ি গিয়ে রত্নাকে বলে, খেতে দাও রত্না ভীষণ ক্ষিদে—। তারপর জলে ভিজিয়ে-রাখা রুটি, ঢ্যাঁড়সের তরকারী আর ঝোলাগুড় খায়। তবু ত নিজেদের বাড়ি; শান্তি—অনেক শান্তি।

বুড়ুস মুখ নীচু করে রইল—খাওয়া বন্ধ করে—পা-দুটো শক্ত হয়ে গেল। বুড়ুস ভাবল এক্ষুণি এষা অরুর মা-বাবার সামনে ওর অপমানের কথা বলে দেবে। বুড়ুসের মনে হল অনেকক্ষণ সময় বয়ে গেল।

অরুর মা বললেন, আয় এষা, বোস। কিছু খাবি না?

না মাসীমা, এই ত খেয়ে এলাম।

এষা অরুর বাবার পাশে চেয়ার টেনে বসল, তারপর নিজেই বুতুসের দিকে চেয়ে বলল, আরে ? তুমি যে ?

বুতুসের গলা বুজে এল।

জবাবে কি বলবে ? ও যে এখানেও চুরির মিথ্যা দায়ে ধরা পড়ে নি—এখানেও যে মার খায়নি এখনো ; এটা বোধ হয় এষার আশ্চর্য লেগেছে।

বুতুস জবাব দেবার আগেই অরু বলল, ও আমার বন্ধু, বুতুস—খুব ভাল ছেলে। আমরা একসঙ্গে খেলি। জানিস এষা, ও এবার পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছে।

এষা বলল, জানি। তোর বলতে হবে না। বুতুসদা দাদার সঙ্গেই ত পড়ে। তাই না ? বলে, বুতুসের দিকে তাকাল।

বুতুস মুখ নীচু করেই মাথা নাড়ল। খুব অবাক হল। এষা ওকে বুতুসদা বলে ডাকল বলে।

অরুর মা বললেন, বুতুসটা ভারী লাজুক। ছেলেদের এত লাজুক হওয়া ভাল নয়।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার আর এক হাত ক্যারাম খেলা হল। এষাও খেলল। এষা আসন-পিঁড়ি হয়ে গালিচের উপর ওর সুন্দর লেসের ফ্রক দিয়ে হাঁটু ঢেকে বসল। সুন্দর ফর্সা আঙুল দিয়ে ক্যারাম খেলল। সেদিন রাতের স্বল্পালোকিত চত্বরে দাঁড়িয়ে বুতুস এষাকে ভাল করে দেখতে পারেনি। আজ ঘর-ভরা বিকেলের আলোয় ওকে কাছ থেকে দেখল।

এষার মত সুন্দর কোনো কিছু বুতুস এর আগে আর কখনো দেখেনি—কোনো চাঁদনী রাত না, কোনো জোনাকি-জ্বলা সন্ধ্যে না, কোনো মাছরাঙা পাখি না, বুতুসের ছোট জীবনে এষা সেই বিকেলে একটি আশ্চর্য বিস্ময় হয়ে দেখা দিল। বুতুস মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে রইল। ক্যারামের একটি গুটিও বুতুস সেদিন নেটে ফেলতে পারল না।

অরু বলল, কিরে ? তোর কি হল ? একদম খেলতে পাচ্ছিস না কেন ?

এষা হাসল—বলল, আমাকে ইচ্ছা করে জিতিয়ে দিচ্ছে ; মানে বুতুসদা ইচ্ছা করে আমার কাছে হেরে যাচ্ছে।

বুতুস একবার মুখ তুলে এষাব মুখে তাকালো। তারপর আবার চোখ নামিয়ে নিল।

বুতুসটা ভারী ক্যাবলা—বুতুস নিজে নিজেই নিজেকে বলল।

খেলা শেষ হল।

বুতুস বলল, আমি চলি অরু, এ্যাঁ ?

এষা বলল, আমার সঙ্গে রমলাদি আছে—আমরা এখান থেকে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাব, যাবে অরুদা ? বুতুসদা চলো না ?

অরু বলল, আমি মা-বাবার সঙ্গে সিনেমায় যাব। চার্লি চ্যাপলিনের গোল্ড-রাশ। এষা, তুই বুতুসকে নিয়ে যা।

বুতুস বলল, না না, আমারো কাজ আছে—বাবা-মার সঙ্গে বেরোতে হবে।

এষা বলল, কোথায় ?

বুতুস বলল, তা ত জানি না—ওঁরা কোথায় নিয়ে যাবেন। প্রতি রবিবারে ওঁরা আমাকে বেড়াতে নিয়ে যান।

বুতুস বানিয়ে বলল। শুধু বেড়াবার জন্যে বাবা-মার সঙ্গে বুতুস কতদিন বেরিয়েছে তা হাতে গুণে বলতে পারে। তবু বুতুস বলল, নইলে ওর মা-বাবা অরুর মা-বাবার তুলনায় ছোট হয়ে যাবেন।

এষা আবার বলল, কখন ?

বুতুস আবার থামল, বলল, এই ছ'টা-টটার সময়।

এষা বলল, ছ'টার অনেক দেরী আছে—আমার সঙ্গে এখন চলো, তোমাকে পাঁচটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাব।

অরু বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ চলে যাও বুতুস। এষা বেচারি একা একা যাবে।

অগত্যা বুতুস এষার সঙ্গে বেরোল।

প্রকাণ্ড একটা কালো রঙের গাড়ি—প্রায় সেই গান্ধীজীকে দেখতে যাওয়ার দিনের গগনমল লাডসারিয়ার গাড়িরই মত—দাঁড়িয়েছিল।

ইভ্রাভার দরজা খুলে দিল। এষা বুত্নসকে আগে উঠতে বলল, তারপর নিজে উঠল।

রমলাদি, এষার সামনে বসল। ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ল।

গাড়িটার গদীটা দারুণ—পায়ের নিচে ইয়া-পুরু গালিচা। পা ডুবে যায়।

ফুর্ ফুর্ করে হাওয়া লাগছে গায়ে। বুত্নস এক কোণায় কুঁকড়ে বসে রইল।

এষা বলল, গঙ্গার ধারে যেতে তোমার ভাল লাগবে ত বুত্নসদা?

বুত্নস মাথা নোয়াল।

এষা বলল, আমি ত প্রায় রোজই যাই—ভাল লাগে না তাই একা একা। তুমিও কি প্রায়ই যাও?

বুত্নস মিন্‌মিন্ করে বলল, একবার গেছিলাম।

এষা চমকে উঠে বলল, সে কি একবার গেছ মাত্র? কতদিন আগে?

বুত্নস বলল, বোধহয় দু বছর আগে।

এষা কোনো উত্তর দিল না।

বুত্নসও চুপ করে বসে রইল। সেই একদিন আগে পিসেমশাই এসেছিলেন যখন, তখন সকলে মিলে একবার গেছিল।

অনেকক্ষণ পরে বুত্নস সাহস সঞ্চয় করে ও নিজের কুণ্ঠা কাটিয়ে বলল, তুমি মা বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাও না?

এষা অবাক হল মনে হল, বলল, আমার ত মা নেই। তুমি জানোনা? আমি যখন তিন বছরের তখন মা মারা গেছেন।

এবার বুত্নস চমকে উঠল। বলল, মা নেই?

এষা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, নেই।

বুত্নসের মনটা ব্যথায় ভরে গেল—সমস্ত বিকেল ব্যথাতুর হয়ে গেল। চুপ করে ও বসে রইল।

অনেকক্ষণ পর এষা বলল, জানো? আমার ঘাড়ে কিন্তু সেই ব্যথাটা আছে।

বুত্নস বলল, কিসের ব্যথা?

এষা বলল, ঐ যে দাদা মেরেছিল।

বুহুস এবার সহজ হল। বলল, বাজে কথা। এত দিন হয়ে গেছে, ব্যথা কখনোই নেই।

এষা বলল, আজ্ঞে না স্যার, আছে।

বুহুস একবার তাড়াতাড়ি নিজের দিকে তাকাল। আজও বুহুস খাকি হাফপ্যাণ্ট আর ডোরাকাটা সস্তা ছিটের জামা পরে আছে—পায়ে অবশ্য আজ নটীবয় জুতো ও মোজা আছে। কি মনে হল, বুহুস বলল, আজকে কিন্তু আমি জুতো পরে এসেছি।

এষা মুখ ফেরাল, তারপর ঝুঁকে পড়ে বুহুসের থ্যাঁতলানো জুতোর দিকে দেখল—তারপর বলল, তুমি কি করে ক্লাসে সেকেণ্ড হও আমি জানি না। আমি সত্যি জানি না বুহুসদা। তুমি কিন্তু খুব বোকা।

বুহুস বলল, হুঁ।

এষা বলল, হুঁ কি? তুমি জানো যে তুমি বোকা?

বুহুস বলল, হুঁ। বোকাই ভাল।

এষা বলল, এই শোনো বুহুসদা, আমার দিকে ফেরো—।

বুহুস মুখ ফেরালো, এষা বলল, আমার কিন্তু বোকাদেরই ভালো লাগে। আমি নিজেও বোকা কিনা?

তারপর সামনের সীটে-বসা ঘোমটা-মাথায় আয়ার দিকে ফিরে বলল, রমলাদি, এই-ই' সেই বুহুসদা—দাদার বন্ধু। যাকে দাদা সেদিন মেরেছিল।

রমলাদি একবার বুহুসের মুখের দিকে তাকালেন।

তারপর বললেন, তোমার দাদার ত কাজই অমনি।

বুহুসের ভাল লাগল না। বুহুসের মনে হতে লাগল যে ওরা দল বেঁধে বুহুসকে সমবেদনা জানাতে এসেছে—সাগরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

এ বুহুস চায়নি। বুহুস রোজ সকালে এক্সারসাইজ করছে—একদিন বুহুসের গায়েও জোর হবে। তখন সে সাগরকে এবং সেই ঢ্যাঙা,

চোখ-ঘোলা ছেলেটিকে দেখে নেবে। শক্ত হাতে কপালে ঘুষি মারবে সাগর অন্যায় করেছে তার জন্যে তার বোনের ত কোনো দরকার নেই সমবেদনা জানাবার।

গঙ্গার ধারে পৌঁছে এষা বলল, বুহুসদা হাঁটবে?

বুহুস বলল, চলো।

ওরা নেমে গঙ্গার পাশের বাঁধানো পথে পায়চারি করতে লাগল। গঙ্গার ঘোলা জল বয়ে চলেছে। কত নৌকো ভাসছে। ষ্টীমার ভোঁ-ভোঁ করছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। বুহুসের ইচ্ছা হয় বড় হয়ে ও পড়াশুনা করতে বিলেতে যাবে। জাহাজে চড়ে।

নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুহুসের বরিশালের কথা মনে হল। বরিশালেও ত অনেক নদী। এরকম ষ্টীমারে যাবে। হঠাৎই এষাকে বুহুসের নদীর মত মনে হল। নদীর মত স্বচ্ছতোয়া। কোনো বাধা নেই, কুণ্ঠা নেই, কোনো ব্যাপারে কোনো সংকোচ নেই। কেমন স্বচ্ছন্দে বুহুসকে বেড়াতে নিয়ে এল, কেমন বুহুসদা বুহুসদা বলে ডাকছে। বুহুস একবার ভাল করে এষার মুখের দিকে তাকাল। বুহুসের মনে হল এষা ওদের বাড়ির সকলের চেয়ে অন্য রকম। এষার মুখে যেন বুদ্ধির পাউডার মাখানো আছে। অথচ ওদের বাড়ির আর সকলের মুখে কেমন একটা দাম্ভিক বুদ্ধিহীনতা। এষা একেবারে অন্যরকম।

এষা বলল, বুহুসদা আইক্রীম খাবে?

বুহুস আবার লজ্জা পেল—বলল না, না। আসলে কিন্তু খেতে ইচ্ছে হয়েছিল।

এষা শুনলো না। তুটি চকোলেট বার কিনল। ম্যাগনোলিয়ার। রমলাদি পয়সা দিল।

আইসক্রীম খেতে খেতে বুহুস বলল, মানে এই প্রথম কথা বলল, তুমি কোন স্কুলে পড়? এষা?

এষা বলল, ডায়াসেশানে পড়ি। সেণ্ট জনস্ ডায়াসেশানে।

বুহুস বলল, তুমি বুঝি পড়াশুনায় ভাল।

এষা হাসল—আইক্রীম খেতে খেতে।

বলল, তোমার চেয়ে ভাল নই। তুমি ত এবার সেকেণ্ড হয়েছ। আমি থার্ড হয়েছি।

সত্যি? বুতুস বলল। তারপর বলল, আমার স্কুলের চেয়ে তোমার স্কুলটা অনেক ভাল।

হঠাৎ এষা বলল, বুতুসদা আমাদের বাড়ি আসবে সামনের শনিবার? আমার জন্মদিন।

বুতুস চমকে উঠল। বলল, তোমাদের বাড়িতে? আবার দারোয়ানের গলাধাক্কা খাবার জন্যে? তোমার দাদা আমাকে দেখতে পারে না। আমার বড় খারাপ লেগেছিল। মিছিমিছি। অপমান কাকে বলে সেদিনই প্রথম জেনেছিলাম।

তারপর একটু থেমে বলল, আমার কি কোনো সম্মান নেই এষা?

এষার মুখটা বেশ শক্ত দেখাল। বলল, তোমার সম্মান আছে বলেই তোমাকে আমি নেমন্তন্ন করছি। সেদিন দাদা তোমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আজকে আমি তোমাকে আদর করে নেমন্তন্ন করছি। তোমার সম্মান জ্ঞান আছে বলেই তোমার আসা উচিত।

বুতুস বলল, না, মানে কলকাতায় থাকলে আমি যেতাম। আমরা যে পরশুদিন চলে যাচ্ছি।

চলে যাচ্ছ? কোথায়?

বরিশালে।

কেন?

আমার বাবা বদলী হয়ে গেছেন।

কবে ফিরবে?

তাত জানি না। যতদিন বাবা আবার বদলী না হন।

ও। বলল এষা। এষা তারপর কোনো কথা বলল না।

তারপর ওরা অনেকক্ষণ পায়চারী করার পর এষা বলল, চলো এবার ফিরি বুতুসদা। তুমি ত আবার তাড়াতাড়ি যাবে—মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে।

বুহুস বলল, চলো।

বুহুসদের বাড়ির কাছে এসে বুহুসের ভারী লজ্জা করছিল—গলির মধ্যে ওদের পুরোনো বাড়িটা দেখাতে।

এষা অধৈর্য গলায় বলল, কি যে ঐ-যে ঐ-যে করছ—কোন্‌টা বলো না?

বুহুস বলল, ঐ যে দরজা—দরজায় বাবার নাম লেখা প্লেট আছে। আর ঐ যে গলির দরজা। খুব কষ্টার সঙ্গে বলল বুহুস।

এষা বলল, বাঃ করবীগাছটা ভারী সুন্দর ত। কী সুন্দর ফুল ফুটেছে।

বুহুস বলল, হ্যাঁ। ওটা সেজকাকু রথের মেলা থেকে আমায় কিনে দিয়েছিলেন।

বুহুস গাড়ি থেকে নামতে গেল—তারপর দরজা খুলে বলল, শনিবার তোমার জন্মদিন—আমার থাকা হবে না। তোমাকে ত কিছু দেওয়া হল না; হবে না। এষা চোখ নাচিয়ে বলল, তুমি ত খুব পাকা হয়েছ। কিছু দিতে হবে না।

বুহুস প্যান্টের ডান পকেটে হাত চালিয়ে একটা লাল-রঙা মার্বেল পেল। ওর বড় প্রিয় মার্বেল। যেখানেই যাক না কেন, ও পকেটে এটাকে নিয়ে বেড়ায়। বুহুস পকেট থেকে সেটি বের করে বলল—এষা তুমি এটা রাখো। আমি ত বরিশালে চলে যাবো—কত দিন থাকবো না। তুমি এটা তোমার কাছে রেখো। এটা দেখলে আমার কথা মনে হবে। জানো এষা, তুমি না, সাগরের মত একটুও নও—তুমি অন্যরকম—একদম অন্যরকম।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি বরিশালে গেলে তুমি চিঠি লিখবে?

এষা বলল, লিখতে পারি। যদি তুমি আগে আমাকে লেখ। ঠিকানা দিয়ে।

বুহুস বলল, লিখব।

এষা বলল, চলি বুহুসদা। বরিশালে ভাল হয়ে থেকো।

বুহুস বলল চলি—তুমিও ভাল হয়ে থেকো।

বুহুস বাড়ি ঢুকে দেখল, বাবা নেই; মা বাইরের ঘরে টেবিল পরিষ্কার করছেন। বুহুস বাথরুমে চান করতে গেল।

প্যাণ্ট-শার্ট হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখে ঝুপ্ ঝুপ্ করে জ ঢালল।

চৌবাচ্চার জলে সবুজ আলো পড়েছে ঘুলঘুলি দিয়ে—সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুহুস ভাবল, এষাটা ভীষণ ভালো। এক ওর মা ছাড়া এত ভালো বুহুসের আর কাউকে লাগেনি। চান করতে করতে বুহুসের খালি এষার কথা মনে হতে লাগল।

চৌবাচ্চার জলে মগ ডুবোতে জলে থৈ-থৈ করে ঢেউ নাচতে লাগল—পারে পারে গাবুক্-গুবুক্ আওয়াজ হতে লাগল, ছোট ছোট ঢেউ কাঁপতে কাঁপতে নাচতে নাচতে ঘুলঘুলির আলোয় ভাসতে ভাসতে চৌবাচ্চার পারে পারে ছুটে গেল।

মাঝে মাঝেই বুহুস যেমন ছোট হয়ে যায়—ঘাসবনে ঘাসফুলে এ্যাডভেঞ্চার করে বেড়ায়—সেই শেষ বিকেলে ও আবার সেদিন ছোট হয়ে গেল—ছোট হয়ে হয়ে একটি লাল মাছ হয়ে গেল—হয়ে গিয়ে চৌবাচ্চার জলে সাঁতরাতে লাগল—বিরাট বিরাট ঢেউয়ের বুকে উঠতে পড়তে লাগল—বুহুস লাল মাছ হয়ে জলের মধ্যে দূরের ষ্টীমারের শব্দ শুনতে লাগল।

বুহুস মাছ হয়ে চৌবাচ্চার ঘন সবুজ জলে টুকুস্ করে ডুব দিল—বুহুসের মনে হল চৌবাচ্চার একেবারে নীচে—যেখানে শ্যাওলারা থাকে—প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের মত—যেখানে ভয়ংকর ভয়ংকর সব বড় মাছ আর হাঙ্গর ঘুরে বেড়ায়—বুহুস সেখানে পৌঁছে গেল—পৌঁছে দেখল, ঘন সবুজ শ্যাওলার ঘরে ফিকে সবুজ ফিন্‌ফিনে মশারী ঝুলছে—বুহুস লাল মাছ হয়ে ডানা দিয়ে সেই মশারী তুলল—দেখল সেই মশারীর মধ্যে একটি রুপোলি ঝিনুক। তার মধ্যে এক দারুণ সুন্দরী রাজকন্যা বসে আছে। রাজকন্যা মুখ ফিরিয়ে আছে। বুহুস লাল মাছ হয়ে বুড়বুড়ি তুলে নিঃশ্বাস নিল।

রাজকন্যা হঠাৎ চুল ছড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে বুদ্বুসের দিকে তাকাল— বুদ্বুস দেখল, আরে? এ যে এষা!

বুদ্বুসের মনে পড়ল, লাল মার্বেলটার কথা। ওর প্রিয় মার্বেল

সেদিন গভীর রাত্তিরে ঠাণ্ডা দেওয়ালের গা ঘেঁষে শুয়ে বুদ্বুস স্বপ্ন দেখল যে, রংপুরের হরিসভার পুকুর পাড়ে অনেক কদমফুল ঝরে পড়ে আছে। আগের দিন রাতে খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে—।

বুদ্বুস অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে দুটি তুলতুলে কদমফুল বুকের কাছে নিয়ে একা একা আপন মনে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে গেল।

বালক বুদ্বুস ছোটবেলার মাঠ পেরিয়ে চন্দনকাঠের চৌকাঠ অতিক্রম করে, কৈশোরের সুগন্ধি উন্মনা উঠোনে কদমফুল বুকে করে এসে দাঁড়াল।

বুদ্বুস ঘুমের মধ্যে, সেই স্নিগ্ধ শিরশিরানি-তোলা স্বপ্নের মধ্যে ভালো লাগায় বার বার কেঁপে উঠতে লাগল।

তৃতীয় অধ্যায়



সবে ভোর হয়েছিল। খুলনা স্টেশনের প্লাটফর্মে সবে প্রথম রোদ লেগেছিল। দূরে নদীতে দাঁড়ানো ষ্টীমার থেকে ভোঁ ভোঁ করে সীটি বাজছিল।

বুহুস মা-বাবার সঙ্গে ষ্টীমারে গিয়ে উঠল। এর আগে ও কখনো ষ্টীমারে চড়েনি। দেখেওনি। ফার্স্ট ক্লাসের কেবিন ও ডেক ষ্টীমারের একেবারে সামনে। সবসময় হু-হু করে হাওয়া দেয়। সেকেণ্ড ক্লাস তার পেছনেই। একতলায় ও দোতলার পেছন দিকে ডেকের প্যাসেঞ্জারদের ভিড়। ষ্টীমের সোঁদা-সোঁদা গরম ধুঁয়ো-ওঠা গন্ধ। এইটেই বোধ হয় ষ্টীমারের গায়ের গন্ধ। ভাবল বুহুস। তারপর যখন সেকেণ্ড ক্লাসের ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নদী, লোকজন, জেটি—গাধাবোট—সব চোখ চেয়ে চারধারে দেখতে লাগল—নৌকোর দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ শুনতে লাগলো তখন ভারী ভালো লাগল বুহুসের।

ষ্টীমারের নাম ফ্লোরিকান। পাখির নাম। কি পাখি?

একসময় সত্যিই ষ্টীমার ছাড়ল। দুপাশের বড় বড় চাকাগুলো ধীরে ধীরে জল কাটতে লাগল। তারপর—ধীরে ধীরে ষ্টীমার সোজা জেটি ছেড়ে প্রথমে গভীর জলে চলে এল পাশাপাশি, তারপর নদী বেয়ে নেমে চলল।

একটু পরই খুলনা স্টেশন, সুপুরীর বন, লোকালয় সব মিলিয়ে গেল! বুহুস একা-একা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল—বুহুসের চোখে-মুখে-চুলে নোনা হাওয়া এসে লাগতে লাগল। পাল তুলে কত নৌকা চলছে—ষ্টীমারের দু-কূল ছাপানো ঢেউয়ে উথালি পাথালি করছে নৌকাগুলো—তারপর ঢেউগুলো পেছনে—নদীর দুপারে গিয়ে লাগছে—ছপাং ছপাং করে জল ছিট্‌ছে—সাদা ফেনা বিড়বিড়িয়ে উঠে

চুপ করে যাচ্ছে—তখন বড় ভাল লাগল দেখতে। মাঝে মাঝে সাদা সী-গাল এসে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে ষ্টীমারের দুপাশে উড়তে উড়তে চলতে লাগল।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দুপাশের ধানক্ষেত, নারকোল গাছের সারি দেখতে দেখতে বুতুসের মনে হল বুতুস যেন কোনো রূপকথার রাজ্য দিয়ে চলেছে। ছবির পর ছবি, তারপর ছবি। ফেলে আসা কোলকাতার জন্যে যেমন বুতুসের কষ্ট হচ্ছে তেমন নতুন জায়গা দেখবে, নতুন দেশে বেড়াবে এও ভাবতে ভালো লাগল বুতুসের। দেখতে দেখতে বুতুস যেন রেলিং ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মা ডাকলেন, বুতুস খাবে এস।

বাবামায়ের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাওয়ার জন্যে ডাকছেন মা? তবে কি বুতুস বড় হয়ে গেল নাকি? বুতুস অবাক চোখে মাব দিকে তাকাল।

বুতুস কেবিনের মধ্যে ঢুকে এল। দুপাশে যাতায়াতের মত পথ। একটি টেবল। ট্রেতে করে বেয়ারা চা, টোষ্ট, ডিম দিয়ে গেছিল।

মা দুধ তুলে দিলেন বুতুসকে। বাবা মায়ের সঙ্গে এক টেবিলে খাবার খেয়ে, চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে বুতুস সত্যিই নিজেকে অনেক অনেক বড় মনে করল। বুতুসের খুব আনন্দ হল। কোলকাতা ছাড়ার পরই মা-বাবার ব্যবহার তার সঙ্গে কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে—বুতুসও যে একজন মানুষ—মানে একজন লোক—আলাদা লোক, এমনি একটা ভাব করছেন মা-বাবা। রাতারাতি এমন বড় হয়ে যাবে বুঝতে পারেনি বুতুস—।

খাওয়ার পর বুতুস ডেকে গেল। পেছনের ডেকে।

কত লোক—কত রকমের লোক—ছেলে, মেয়ে, বুড়ো। কি রকম টান দিয়ে দিয়ে কথা বলছে অনেকেই। চলতে চলতে শুনছে বুতুস একজন মাঝবয়সী লোক একটি ছেলেকে হাসতে হাসতে বলল, বোঝলা ভাই ডি—"এরেই কয় বরিশাল—আইতে শাল যাইতে শাল"।

বুতুস মনে মনে কথার মানে না বুঝেই ফিক্ করে হেসে দিল।

বেশ লাগল শুনতে কথাটা। "এরেই কয় বরিশাল—আইতে শাল যাইতে শাল"।

লোকের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে বুহুস ষ্টীমারের পেছনের ডেকে এসে দাঁড়াল—এখানে দাঁড়িয়ে ঢেউগুলো দেখতে আরও ভালো লাগে। নোঙর করার শিকল রয়েছে পাকানো বড় বড় লোহার আংটায় বাঁধা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফেনার ফোয়ারা দেখল জলে বুহুস। তারপর ডেকের দিকে চেয়ে হঠাৎ বুহুস দেখল যে ডেকের মাঝামাঝি একটা জায়গায় কিছু যাত্রী বসে-দাঁড়িয়ে ভিড় করে আছে। এর মাঝে মাঝে শুধু কথার আদান-প্রদান চলেছে। ব্যাপার কি দেখার জন্যে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বুহুস। যখন সেই জন-বৃত্তে গিয়ে পৌঁছল তখন দু'জন লোকের কোমরের ফাঁক দিয়ে ও দেখল যে হুঁকোহাতে একজন লোক বসে আছে এবং কোমরে হাত দিয়ে আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোক উচ্চস্বরে বসে-থাকা ভদ্রলোককে শুধোলেন, মহাশয়ের নাম কি?

যা বোঝা গেল, ততক্ষণে ঝগড়া হয়ে গেছে এক প্রস্থ—নাম না জেনেই। এখন নাম জানার পালা।

বসে-থাকা ভদ্রলোক হুঁকো খাচ্ছিলেন—হুঁকোটা মুখ থেকে সরিয়ে একটু কাশলেন কোনো কেয়ার না করে—তারপর বললেন, আমারে চেনো না? I am the যোগেন ছন্দ অব খুল্‌না।

তারপর দুজনে এবং শ্রোতারাও সব চুপ চাপ।

একটু পর The যোগেন ছন্দ অব খুল্‌না গলার কণ্ঠিরমালা নেড়ে বিপক্ষের লোকটিকে বলল, মশায়ের পরিচয়টা কি?

পরিচয়? বলে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি কোমরে হাত দিয়ে একবার কেঁপে উঠল।

তারপর কাক তাড়ুয়ার মত মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—আমারে চেনে না কেডা? তার পর ডান হাতে বুকের উপর দু থাপ্পর মেরে বলল, I am the, the, the, গণপতি রায় অব বরিশাল। The, the, the গণপতি রায় অব বরিশাল।

বুহুস, আবার ফিক করে হেসে উঠল—তারপর লোকের গায়ের গন্ধ-ভরা ভিড় ছেড়ে আবার সেকেণ্ড ক্লাসের ডেকে এলো এবং একটা ডেক চেয়ারে বসল।

মা-বাবাও চেয়ারে বসেছিলেন। মা খবরের কাগজ পড়তে চেষ্টা করছিলেন কিন্তু হাওয়ায় পাতাগুলো কেবলি ফরফরিয়ে উড়ছিল। হঠাৎ মা খবরের কাগজ পড়া থামিয়ে বাবাকে বললেন, ডেকে বসে এই কাগজ ওড়া দেখে সেই চার-অধ্যায়ের কথা মনে পড়ছে।

বাবা বললেন, কি কথা?

মা বললেন, সেই কবিতাটি—। তারপর মা কেমন লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললেন—সেই যে—

"প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস
তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ।"

বাবার মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, মনে পড়েছে।

বুহুস যখন বড়ই হয়ে গেছে, তখন বুহুস ভাবল, বাবা মার সঙ্গে একটু আলোচনাতেই বসা যাক।

বুহুস বলল, সর্বনাশ কেন মা?

মা কিছু বলার আগেই বাবা মুখ ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে অন্যদিকে চেয়ে নিজের মনে বললেন, সেইটাই ত প্রশ্ন?

মা বুহুসের দিকে কট্‌মট চোখে চেয়ে বললেন, বড়দের কথায় কথা বলবে না বুহুস। তোমাকে অনেকদিন বলেছি।

বুহুস হঠাৎ চুপ্‌সে গেল, তারপর উঠে আবার জল দেখতে লাগল।

আসলে চা খেয়ে বুহুস ভেবেছিল ও বড় হয়ে গেছে কিন্তু আসলে ও বড় হয় নি। মা বাবা ওকে নিয়ে পুতুল খেলেন।

বুহুসের সত্যিকারের কোনো বন্ধু নেই। বুহুসের বন্ধু কেবল এই আকাশ জল, এই রোদে-ওড়া ডানার আঁশটে গন্ধ-ছড়ানো রুপোলি পাখি—এই বাতাস—তীরের ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ—নারকোল গাছের রোদ্‌-পিছলানো হাতছানি—এই সব—বুহুসের এরাই সঙ্গী। বুহুসের সত্যিকারের কোনো বন্ধু নেই। রংপুরে পুঁটু ছিল—তাও

সে সম্পূর্ণ বন্ধু নয়। বন্ধুত্ব কাকে বলে বুতুস জানে না—আকাশের দিয়ে চেয়ে, বাতাসের বাঁশী শুনতে শুনতে যখনি মনে মনে নিজেকে ভীষণ একলা, বিষণ্ণ ও নির্জন মনে হয়, তখন সেই বিষণ্ণতা যার সঙ্গে থাকলে সম্পূর্ণভাবে কাটে সেই বোধ হয় প্রকৃত বন্ধু। জানে না বুতুস। বুতুস এ জন্মে কেবল ভাবতে এসেছিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন বুতুসের বুককে চাকার পাশের ফেনিল জলের মতো তোলপাড় করে। সেই উচ্ছ্বসিত জলরাশির মতো বুতুসও বুকের মধ্যে প্রশ্নরাশির শব্দ শুনতে পায়।

জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুতুসের হঠাৎ এষার কথা মনে পড়ল। এষার লেস-বসানো ফ্রক। সুন্দর ফর্সা পা দুটি—কোঁকড়ানো একটু কটা-কটা চুলের রাশি—আর এষার চোখ দুটি। এষার চোখ দুটির কথা বার বার মনে পড়ল বুতুসের। চোখের নতুন নাম দিয়েছে বুতুস। সব মানুষের চোখের। চোখের নাম জানলা। চোখের মালিককে জানার দেখার জানলা।

এই রকম একটি নতুন নাম ভেবে বের করতে পারায় বুতুস নিজের উপর মনে মনে বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে।

কখন রাত হয়েছিল মনে নেই—কিন্তু একসময় একটা গোল থালার মত সূর্য ছেঁড়া ছেঁড়া বর্ষার মেঘের মাঝে মাঝে এসে, ছেলেরা যেমন স্প্রিংবোর্ড থেকে জলে ঝাঁপায় তেমনি করে হঠাৎ শান্ত নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পরে আকাশে আর জলে অনেকক্ষণ একটি চিকন আলোর আভা ছিল—টলমল করে সেই আভা জলের উপর কেঁপেছিল—সেই আভার আয়নায় দুপাশের নারকোল গাছের সারি তাদের ঢলঢলে মুখ দেখেছিল। তারপর ষ্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে আসা শেষ সী-গালটিও একসময় হঠাৎ হারিয়ে গেছিল—বুতুস হাওয়ায় আর গাঙশালিকের ঠোঁটের গন্ধ পাচ্ছিল না।

একসময়, অন্যমনে, অনবধানে সন্ধ্যা এসে নদীর বুকে চুল খুলে দাঁড়িয়েছিল।

ষ্টীমারের আনাচে কানাচে, ডেকে, কেবিনে, এঞ্জিনঘরে বাতি জ্বলে উঠেছিল। একসময় রাত গভীর হয়ে গেছিল।

বুদ্বুস ঘুমিয়েছিল—মা ডেকে তুললেন। তাড়াতাড়ি করে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে নিয়ে, চা-খাবার খেয়ে বুদ্বুস তৈরী হয়ে নিল জামাকাপড় পরে।

কি একটা জায়গায় ষ্টীমার ভিড়ল। বুদ্বুস দেখল লেখা আছে ঝালকাঠি।

সকালের রোদ পড়েছে বন্দরে। জেটিতে এসে ষ্টীমার লাগল। অনেক ছোট বড় মহাজনী নৌকা এ-পাশে ও-পাশে বাঁধা আছে। ছোট ছোট ছইওয়ালা নৌকোও আছে। আরো ছোট মাছ-ধরা নৌকোও আছে এপাশে ওপাশে। ষ্টীমারের ভোঁ বাজল। লোকজনের চীৎকার।

বুদ্বুসের পাশের ফার্স্ট-ক্লাসের কেবিনের এক ভদ্রলোক—প্রায় বাবার বয়সী—নাম সুরেশবাবু—হঠাৎ মা-বাবাকে বললেন, এইখানে একটি মজার ব্যাপার হয়েছিল। ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবা-মায়ের আলাপ হয়েছিল গতকালই। উনি বেশ হাসিখুসী ও মজার।

ভদ্রলোক বললেন—অফিসের কাজে একবার আমি ঝালকাঠিতে ক্যাম্প্ করেছি বরিশাল থেকে এসে। ডাকবাংলোতে উঠব—গরমের দিন। পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি ছাতা মাথায়। আমার একটা লাল নীল ছাতা ছিল। কোলকাতা থেকে সখ করে কিনেছিলাম—এমনিতে গাড়ির পেছনে রেখে দিই। বৃষ্টি বাদলায় কাজে দেয়। ছাতা মাথায় চলেছি—এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়লো একটি বাড়ির জানলায়। শুনলাম একজন মহিলা উঁচু গলায় ডাকছেন খোকন, খোকন।

সায়াহ্নকার ঘরের ভিতর থেকে সেই ভদ্রমহিলার খোকন কি বলল জানি না—তবে ভদ্রমহিলা আবার চেঁচিয়ে বললেন, দৌড়ে আয়, বুড়োখোকা দেখবি ত আয়।

আমার নিজেরই কথাটা শুনে হাসি পেল, লজ্জাও হল। ভদ্রমহিলাকে দেখলাম, অল্পবয়সী বেশ সুন্দরী এক মহিলা—তবে খোকনকে দেখলাম না। ভদ্রমহিলা তন্ময় হয়ে লাল নীল ছাতা মাথা দেওয়া বুড়ো খোকাকে দেখছিলেন।

ডাকবাংলোয় পৌঁছানোর পর স্থানীয় এক অপরিচিত ভদ্রলোক এসে আলাপ করলেন—। তার সঙ্গে আমার অফিস-সংক্রান্ত কাজ ছিল। তিনি ভীষণ পীড়াপীড়ি করলেন যেন আমি প্রথম দিনটাতে আর রান্না-বান্নার ঝামেলা না করি। আমি একটু আপত্তি দেখিয়ে পরে নেমন্তন্ন মেনেই নিলাম। সেই ভর-দুপুরে রান্না-বান্না করার ঝামেলাও অনেক।

যথাসময়ে ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে যেতে এলেন তাঁর বাড়িতে খাওয়ার জন্যে। বাড়ির কাছে এসেই আমার বুকটা ধ্বক্ করে উঠল। এ যে সেই বাড়ি, যে-বাড়ির জানলায় মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার আবার হাসি পেল।

মেঝেতে আসন পেতে প্রচুর পদ সাজিয়ে খাবার দেওয়া হল আমায়।

একটি ছোকরা চাকর পাশের ঘর থেকে খাবার-দাবার নিয়ে আসছিল, কিন্তু পর্দার আড়ালে হলুদপেড়ে শাড়ির ঘেরে দুটি ফর্সা পা দ্রুতগতিতে আসা-যাওয়া করছিল। বুঝতে পারছিলাম, তাঁরই নির্দেশে সব কিছু হচ্ছে। মাঝে মাঝে চুরির রিন্ রিন্ ঠিন্ ঠিন্ আওয়াজও হচ্ছিল।

খেতে খেতে আমার কেবলি মনে হচ্ছিল যে ভদ্রমহিলা একটিবার মুখটি দেখালে হয়—তাহলেই চিনতে পারব যাঁকে দেখেছিলাম তিনিই কিনা। আমি দেখতে না পেলেও বুঝতে পাচ্ছিলাম, ও ঘরের আড়াল থেকে উনি আমাকে নিশ্চয়ই দেখছেন। এমন সময় একটি চার-পাঁচ বছরের ছেলে ওঘর থেকে এ-ঘরে এলো—এসে, আমার দিকে গোল্লা গোল্লা চোখে চেয়ে রইল।

আমি খাওয়া থামিয়ে বললাম, কি খোকন? আমাকে চেন?

এই প্রশ্নে খোকন এবং খোকনের বাবা, মানে আমার হোস্ট্, দুজনেই খুব অবাক চোখে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, আমাকে চেনো না? আমি হচ্ছি বুড়োখোকা।

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘরের পর্দার ওপাশের সেই

ফর্সা পা-দুটি হাতের চুরিতে জলতরঙ্গ বাজিয়ে লজ্জায় দৌড়ে অনেক দূর চলে গেল।

ভদ্রলোক বললেন, বুড়োখোকাটা কেডা?

আমি বললাম—আমিই ত?

ভদ্রলোক তবুও বললেন, ক্যান্? আপনে ক্যান্?

আমি বললাম, ক্যান্ তা জানি না, কিন্তু আমিই বুড়োখোকা।

এই গল্প শুনে বাবা-মা খুব হাসলেন অনেকক্ষণ হো হো হিঃ হিঃ করে। বুদ্বুসের হাসি পেল। খুব মজার গল্প ত।

সুরেশ সেন মশায় যেমন ভাবে রসিয়ে গল্পটি বললেন তা দেখে ও শুনে বুদ্বুসের সে ভদ্রলোককে খুবই ভাল লেগে গেল। ভদ্রলোকের এলোমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছিল—পাঞ্জাবীর কোণা পত্ পত্ করে নিশানের মত দুলছিল—উনি গল্প শেষ করে একটি সিগারেট ধরালেন।



এক-এক করে দিন কেটে যাচ্ছে।

বুদ্বুস বরিশাল জেলা-স্কুলে ভর্তি হয়েছে। জর্ডন কোয়ার্টার থেকে বেশী দূরে নয়। স্কুলটা দেখতে প্রায় রংপুর জেলা-স্কুলেরই মত, তবে তার চেয়ে একটু বড়। স্কুলের সঙ্গে বিরাট মাঠ। স্কুলে এখনো বেশী বন্ধু হয়নি বুদ্বুসের। দু'একজন মাত্র। স্কুলের অনেক ছাত্র মুসলমান। বুদ্বুসের একজন মুসলমান বন্ধু হয়েছে সামাদ বলে। পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল সামাদ—চেহারাটাও খুব ভাল।

বরিশালে এসে বুদ্বুস গার্লস্ স্কুলের রসগোল্লা খেয়েছে, নদীর ধারে বেড়িয়েছে, যে-সব কাজ অবশ্য কর্তব্য বলে সবাই বলে দিয়েছেন, সেগুলো করেছে।

কালকে মানী মাসীমার বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল। মাঝে মাঝেই

থাকে। ওরা আমানত গঞ্জ পেরিয়ে, ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর অফিস পেরিয়ে—নদীর ধারের বাড়িতে থাকেন। মানী মাসীমার ছেলে বিষ্ণুদা বুহুসের চেয়ে অনেক বড়। রোগা ছিপ্‌ছিপে চেহারা —বড় বড় ছুটি অভিব্যক্তিময় চোখ—খুব রসিক। বিষ্ণুদার চোখ ছুটি সত্যিই খুব বড় ছিল।

বুহুসের সঙ্গে হারুণ পড়ত। হারুণের বাড়ি মানী মাসীর বাড়ির কাছে। একদিন ক্লাসে বুহুস হারুণকে শুধোল যে, সে বিষ্ণুদাকে চেনে কিনা। হারুণ অনেক ভেবে ভেবে কিছুতেই মনে করতে পারল না—এদিকে বিষ্ণুদা বলেছে যে হারুণদের বাড়ি ওদের পাশের বাড়ি। অনেক করেও বুহুস বিষ্ণুদার কথা হারুণকে বোঝাতে পারল না—কারণ বিষ্ণুদা অন্য স্কুলে পড়ত। যখন বুহুস প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছে তখন হারুণ চেঁচিয়ে উঠল, বলল ও বুঝছি, বুঝছি গোরুর চোক্‌ তাই কও মনি? বিষ্ণু আবার কেডা?

তাই কও, গোরুর চোক্‌ডা তো॰ার বাই? মানে দাদা?

শুনে বুহুসের খুব মজা লেগেছিল। বিষ্ণুর নাম বদলে ওরা গোরুর চোখ রেখেছে চোখ বড় বড় বলে।

আমানতগঞ্জ ত একটুখানি রাস্তা নয়। সমস্ত সহর পেরিয়ে প্রায় যেতে হয়। তারপর লালমাটির রাস্তা নির্জন হয়ে পড়ে। ছুপাশে হোগ্‌লার বাদা দেখা যায়। টিপ্‌ টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ে। মাছরাঙা পাখি এদিকে ওদিকে ভরর্‌ ভরর্‌ করে উড়ে যায়। মুসলমান চাষার বাড়ির বলদ ডেকে ওঠে 'আম্বা' বলে—একটা ছুটো সাইকেল রিক্সা ক্বচিৎ হাঁকু-পাঁকু করে হর্ণ বাজিয়ে—পথ বেয়ে জলে-ভরা গর্ত বাঁচিয়ে এঁকে বেঁকে চলে যায়।

বিকেল গড়িয়ে আসে। সোনার মত রোদের আঁচ হোগলাবনের হলুদে-সবুজ চওড়া পাতায় আগুন ছোঁওয়ায়। জোলো হাওয়ায় হাওয়ায় বাদার জোলো গন্ধ আসে নাকে। পাশের ছায়াচ্ছন্ন শ্যাওলা-ঢাকা উঁচু ডাঙ্গায় ডাহুক্‌ ডাকে। নারকোলপাতার আড়ালে আড়ালে কাঠ-বিড়ালি দৌড়ে যায়—ঝর ঝর করে জল ঝরে পাতা থেকে—মানকচুর

পাতার নীচে কোলা ব্যাঙ থপ্ থপ্ করে। পথের পাশের নর্দমায় জোয়ার-ভাঁটা চলে।

এই বরিশালের বর্ষার বিকেল বুত্থসের মনে তার সমস্ত শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রঙ নিয়ে বরাবরের মত দাগ কেটে বসে।

মানী মাসীমার বাড়ি একবার গেলেই হল। আদর কী আদর! বাড়িটা কাঠের। দোতলা। দোতলায় বারান্দা আছে। বারান্দায় বসে নদী দেখা যায়। বর্ষায় দুকুল ভাসিয়ে চলেছে। সেখানে বসে ষ্টিমারের যাতায়াত চোখে পড়ে। রাতের বেলায় ষ্টিমারের সার্চলাইট গাছপালা-ঘেরা বাড়ির উপর চমকিয়ে যায়।

সেদিন বুত্থস মানী মাসীর বাড়ি ছিল। ওখানে থাকলে প্রায়ই ওর মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। গায়ে কাঁথা জড়িয়ে বুত্থস বারান্দায় এসে দাঁড়ায় ভয়ে ভয়ে। এখানে অনেক ডাকাত আছে। রাতে কেউ বাইরে বেরোয় না। ছোট-বাইরে করার জন্যেও না। প্রত্যেক ঘরের পাশে পাশে পেতলের বড় বড় ডাবর থাকে। রাতে ছোট-বাইরে করতে হলে সেখানেই করতে হয়। এখানের ডাকাতদের হাতে বড় বড় রামদা থাকে। হোগলাবাদায় মাঝে মাঝেই গলা-কাটা লোক পাওয়া যায়।

বুত্থস কাঁথা জড়িয়ে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। নদী বেয়ে হু-হু হাওয়া হাসে—পাতায় পাতায় জল সপ্সপ্ করে—ঝিঁঝিঁ ডাকে—মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে তক্ষক ডেকে ওঠে। মাসীমাদের বাগানে সাপে ব্যাঙ ধরে—রাতের ষ্টিমার সার্চলাইটের ফোয়ারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জলের আয়নায় নিজের মুখ দেখে। ভিজে অন্ধকারে করমচার গন্ধ ভাসে—বাদুড় ওড়ে ঝপ্-ঝপ্,—ঝুপ্-ঝুপ্। টিনের চাল বেয়ে টুপুর টাপুর করে জল পড়ে। কাঁথা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুত্থসের রংপুরের কথা মনে পড়ে যায়।

বিষ্ণুদা ঘুম চোখে এসে দাঁড়ায়। বলে, কি করছিস রে বুত্থস?

কিছু না, এমনিই, দাঁড়িয়ে আছি।

তুই ত কলকাতার ছেলে, তোর আমাদের এই গ্রাম ভাল লাগে?

বুত্রুস চোখ-মুখ নাচিয়ে বলল, দারুণ।

অন্ধকারে বুত্রুসের চোখ মুখ দেখতে পায় না বিষ্ণুদা, শুধু কথাটা শুনতে পায়।

বিষ্ণুদা বলে, আমারও ভাল লাগে রে—আমাদের বাড়ি—আমার হাতে লাগানো গাছ—আমার পোষা প্রজাপতি—সব ভাল লাগে। ভীষণ ভাল লাগে রে। কিন্তু আমাদের ত এখান থেকে চলে যেতে হবে।

কেন? বুত্রুস শুধোলো।

ও কি? তুই জানিস না? পাকিস্তান হয়ে যাবে যে। শীগগীরি।

কেন? বুত্রুস শুধোলো। পাকিস্তান কিরে, বিষ্ণুদা।

মানে আমরা ত স্বাধীন হয়ে যাব। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে যাবে। একদিন না একদিন। তুই জানিস না?

বুত্রুস লজ্জার সঙ্গে মাথা নাড়লো। বুত্রুস ক্লাস ফোরে পড়ে। বিষ্ণু ক্লাস টেনে পড়ে। বিষ্ণু অনেক বেশী জানে বুত্রুসের চেয়ে।

বিষ্ণু বলল, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, কিন্তু খুব সম্ভব হিন্দুরা এক ভাগ নেবে, আর মুসলমানরা একভাগ নেবে। বরিশালে মুসলমানরা বেশী—তাই বরিশাল মুসলমানরা নেবে।

তাহলে কি? তোমরা এখান থেকে চলে যাবে কেন বিষ্ণুদা?

এখানে থাকা যাবে না রে।

কেন?

থাকা যাবে না কেন? কিন্তু ঈজ্জৎ নিয়ে থাকা যাবে না।

ঈজ্জৎ কি বিষ্ণুদা।

অন্ধকারে বিষ্ণুদা একটু হাসল, তারপর বলল, ঈজ্জতের মানে তুই অভিধানে পাবি বটে, কিন্তু সেটা আসল মানে নয়। ঈজ্জতের কোনো একটা কথায় মানে হয় না। ঈজ্জতের মানে বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন। যে যেমন মানে করে।

বুত্রুস ভাবতে পারছিল না যে, মানী মাসীরা এতদিনের বসতবাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।

বুড়ুস বলল, যদি দেশ ভাগ হয় তাতে সকলের মত নেওয়া হবে? কারা ভাগ করবে দেশ?

বিষ্ণুদা হাসল—বলল, যে দেশে নিরানব্বই ভাগ লোক লেখাপড়া জানে না তাদের আবার মতামত কি। কেষ্ট-বিষ্টুরা ঠিক করছে। মুসলমানদের জিন্নাসাহেব, আমাদের নেহরু-সাহেব, সবাই মিলে ঠিক করবে।

বুড়ুস বলল, পণ্ডিত নেহরু ত বড় নেতা, তোমাদের সকলকে তিনি জিজ্ঞেস করলেই ত পারেন?

বিষ্ণু বলল, তুই একটা পাগল। আমাদের মত লোক কত লক্ষ লক্ষ আছে। সবাইকে কি জিজ্ঞেস করা যায়? দেশের স্বার্থে ওঁরা যা ভাল মনে করবেন, তাই করবেন। তাতে কারো কারো অসুবিধা হলেই বা কি করা যাবে।

বুড়ুস এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল, বলল, তাহলে তোমরা যেও না, তোমরা থাকো। মুসলমানেরা কি করবে?

বিষ্ণুদা এবার বারান্দার কাঠের বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসেপড়ে বলল —তা জানি না, তবে থাকা যাবে না।

কেন? বলল বুড়ুস।

বিষ্ণুদা বলল, রান্না ঘরের দাওয়ায় কুকুর শুয়ে থাকলে ঠাকুমা কিছু বলে নি, কিন্তু কোনো মুসলমান ঘরামি শ্রান্ত হয়ে ভুল করে বসে পড়লে, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—গোবরজল দিয়ে দাওয়া ধুয়েছে। আজকে যাদের মুসলমান দেখিস তাদের মধ্যে অনেকে হিন্দুই ছিল —আমাদের জন্যে, আমাদের ঠাকুরদাদাদের তার ঠাকুরদাদাদের সকলের দুর্ব্যবহারেই হয়তো এরা মুসলমান হয়ে গেছে। বুঝলি বুড়ুস —তাদের পাপ—। প্রায়শ্চিত্ত করছি আমরা।

এতসব কথা বুড়ুসের মাথায় ঢুকলো না। বুড়ুস বলল, রংপুর কোন্ দিকে পড়বে?

বিষ্ণু হাসল। বলল, পাকিস্তানে।

বুড়ুসের গলা বুজে এল। বুড়ুসের নাকে রংপুরের ক্ষেতের ধানের

ফেনা-ভাতের গন্ধ এল—নতুন আলুর গন্ধ এল—অনেক অনেক কিছু বুত্নুসের মনে পড়ে গেল। তবে কি ওরাও রংপুর ছেড়ে বরাবরের মত চলে আসবে? জানে না বুত্নুস। বাবাকে জিজ্ঞেস করবে।

সকালবেলা মাসীমার রান্নাঘরে বড় বড় পিঁড়ি পেতে বসে গল্প করে করে ওরা আম দিয়ে দুধ দিয়ে মুড়ি দিয়ে খেল। সঙ্গে, পাশের ময়রার বানানো গরম গরম রসগোল্লা।

রান্নাঘরের এই জায়গাটায় বসে—নদীর একটি দিক চোখে পড়ে। নদীর চরও চোখে পড়ে। এখন বর্ষার সময়; চরের প্রায় সবটাই ডুবে গেছে—তবে উঁচু ডাঙাটি উঁচুই হয়ে আছে—সেদিকে জলের স্রোত যায় না।

মানী মাসীমা প্রায়ই ডাকাতের গল্প করেন। ইদানীং প্রায়ই ডাকাতি হচ্ছে।

সেদিন খেতে খেতে ওরা দেখল চরের ঐ উঁচুমত জায়গায় দুটি নৌকো এসে লাগল। তার মধ্যে একটি লম্বা ছিপ নৌকো। কতগুলি জোয়ান জোয়ান দাঁড়িওয়ালা ষণ্ডাগুণ্ডা লোক কি কতগুলি বোঁচকা বুঁচকি নিয়ে সেখানে নামল।

তাদের সেখানে নামিয়ে দিয়ে আবার নৌকোগুলি ফিরে চলে গেল।

মাসীমা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, কি জানি ডাকাত-টাকাত কিনা? রাতে হয়ত ডাকাতি করতে আসবে।

বুত্নুস দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর যখন মানী মাসীমার বাড়ি থেকে চলে যায়—তখন বুত্নুস আবার লক্ষ্য করল যে, আরো দুটি ঐ রকমের নৌকো এসে চরের ঐ জায়গাতে থামল। মানী মাসীমা অবশ্য তা দেখতে পাননি। বুত্নুস ঠিক করে ফেলল—বাবা যখন অফিস থেকে ফিরবেন, তখন বাবাকে মানী মাসীমার আশু-বিপদ সম্বন্ধে বলতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা বাবা অফিস থেকে ফিরতেই, বুত্নুস বাবাকে ঐ কথা বলল চোখ বড় বড় করে। বাবা এমনিতেই সেদিন দেরী করে ফিরেছিলেন—অফিস থেকে যেন কোথায় গেছিলেন—কিন্তু বাবা

হাত-মুখ না ধুয়েই—চাপরাশী মদনকে (সে, বাড়িতেই থাকত) দিয়ে কাকে যেন কি খবর পাঠালেন। তারপর নিজে রিভলভারটি বের করে গুলি ভরে কোমরে বেঁধে নিলেন।

দেখতে দেখতে ওখানকার ডি. এস. পি. সাহেব এসে গেলেন। উনি বুতুসের বাবার বন্ধু ছিলেন। তারপর ওঁরা দুজনে একটি পুলিশের ওয়েপন ক্যারীয়ারে করে কিছু পুলিশ সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।

মা বাবাকে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, তোমার যাওয়ার কি দরকার? পুলিশের কাজ পুলিশেই করবে।

বাবা বললেন, যাওয়ার দরকার বলেই যাচ্ছি।

তারপর বুতুসের একটুও ঘুম হল না।

এখানে বুতুস মার সঙ্গে এক ঘরে শোয়—আর বাবা পাশের ঘরে শোন। দু'ঘরের মধ্যে একটি দরজা আছে। বুতুস ঘুমিয়ে পড়লে অথবা ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হলে, মা ঐ দরজা দিয়ে বাবার ঘরে চলে যান। তারপর মা কখন ফিরে আসেন তা বুতুস জানতে পারে না। বুতুস তার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সেদিনও মা বুতুসের পাশে শুয়ে রইলেন। দুজনেই এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন বিছানায়। এরই মধ্যে ঝম্‌ঝমিয়ে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। জর্ডন কোয়ার্টারের সমস্ত পাড়া থম্‌থম্ করছিল নিস্তব্ধতায়—এমন সময় বাইরে একটি গাড়ি এসে দাঁড়ানোর আওয়াজ শুনলো বুতুস। এতক্ষণে কি না কি ঘটে গেছে। মাসীমারা বেঁচে আছেন কি মরে গেছেন ভগবানই জানেন। বাবাও সুস্থ আছেন কিনা কে জানে?

গাড়ির আওয়াজ শুনে মা লাফিয়ে উঠলেন বিছানা ছেড়ে—ঘরের বাইরে গেলেন—সিঁড়ির ও বারান্দার আলো জ্বালালেন।

বাইরে, 'চললাম, নমস্কার' ইত্যাদি কথা শুনলো বুতুস। তারপর বাবার গলা শুনলো। বাবার গলার আওয়াজ যে শুনতে এত মিষ্টি বুতুস আগে কোনদিন জানতো না। বুতুসের মনে হল—রোদে অনেক হেঁটে ক্লান্ত হয়ে বড় গাছের নীচে বসলে যেমন আরাম লাগে—নিশ্চিন্ত সোয়াস্তি লাগে—এই দুশ্চিন্তার পর বাবার গলার স্বর শুনে তেমন

লাগল। এমনও ত হতে পারত—যে বুতুসের বাবার গলার স্বর বুতুস আর কোনদিন শুনতে পেত না। ভাবতেও পারে না বুতুস। সে কথা ভাবতেও পারে না।

বুতুস নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল—বালিশে মুখ গুঁজে বালিতে মুখ-গোঁজা হাঁসের মতো কান খাড়া করে উৎকর্ণ হয়ে রইল। কি খবর নিয়ে আসেন বাবা তা শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রইল।

মা, বাবাকে বললেন, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?—খেতে চলো।

বাবা কোমর থেকে রিভলভার খুলতে খুলতে বললেন, ক্ষিদে নেই, —মানীদি ক্ষীর, আম, চিঁড়ে কলা ইত্যাদি দিয়ে আমাকে ও ডি. এস. পি. সাহেবকে ফলার খাইয়ে দিলেন।

আর ডাকাত? মা উদ্বিগ্ন চোখে শুধোলেন।

বাবা বললেন, না, ডাকাতদের খাওয়াননি—আমাদেরই খাইয়েছেন।

তারপর বাবা আবার বললেন, বুতুসকে এ্যারেস্ট করবেন বলেছেন ডি. এস. পি, সাহেব।

মা বললেন, কেন? কেন?

বাবা বললেন, সহরে সাম্প্রদায়িকতা আছে—এর মধ্যে এমন সব গুজব রটালে এ্যারেস্ট করবেন না? গুজব—সে যে-কোনো গুজব রটালেই পুলিশ এ্যারেস্ট করতে পারে। যাকে খুশী।

মা বললেন, সে ত বুঝলাম, কিন্তু ডাকাতের কি হল?

বাবা জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ওঘর থেকে বললেন, ডাকাত কোথায়? মানীদি বললেন, আমি আপনার কলকাতার ছেলেকে ভয় দেখানোর জন্যে ডাকাতের নৌকোর কথা বললাম—সে যে ভয় পেয়ে আপনাদের শুদ্ধু এই রাতে পাঠাবে সে কি আমরা জানি? যাক্, এত কষ্ট করে এসেছেন যখন, তখন বাড়িতে যা আছে তা খেয়ে যান। অতএব পেট ভরে খেয়ে আসতে হল।

বুতুস ভয়ে কাঠ হয়ে রইল। মানী মাসীমার উপর খুব রাগ হল।

এমন রসিকতাও কেউ করে ? একদিন রাখালের পালে বাঘ পড়বে সেদিন মাসী বুঝবেন।

কেউ বলতে পারে পুলিশ-টুলিসের কথা ? হয়ত সত্যিই এ্যারেস্ট করে বসবে বুত্থসকে। বুত্থস মরার মত শুয়ে রইল। ·

মানী মাসীমার উপর বুত্থসের খুব রাগ হতে লাগল।



মাধবপাশায় পিকনিক ছিল। বর্মণকাকুর (বাবা বলতেন মনোরঞ্জন) জীপে করে ওঁরা সকলে মাধবপাশার দীঘির পাশে এসে সকাল সকাল পৌঁছেছিল। অন্যান্যরাও গেছিলেন। ভ্যানে করে। সবাই বরিশাল শহর থেকে।

অশ্বত্থগাছের তলায় একদিকে রান্নাবান্না সুরু হয়ে গেল। মেয়েরা একজোট হয়ে বসে তরকারী কাটতে ও গল্প করতে লাগলেন। কে যেন একজন খুব ভাল কীর্তন গাইতেন। ভদ্রলোক ব্যাংকে কাজ করতেন। তিনি গলা ছেড়ে গান গাইতে লাগলেন, অন্য সকলে আহা আহা করতে লাগলেন। নৌকাবিলাস অথবা অন্য কিছু গাইতেন তিনি প্রায়ই।

এক আনাতে হবে না
দুই আনা দিব কড়ি,
পার করো তাড়াতাড়ি।
দুই আনাতে হবে না

এমনি করে গান চলতো। অবশেষে কেষ্টঠাকুর শ্রীরাধিকার কাছ থেকে ষোলআনা নিয়ে তবে ছাড়তেন। কেষ্টঠাকুর শ্রীরাধিকার কাছ থেকে এক মুঠো খুচরো পয়সা পেলে কার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে

বুহুস জানতো না। কিন্তু নৌকাবিলাস গাইবার সময় সমবেত শ্রোতাদের চোখে চোখে কি যেন চোখাচোখি হত—মেয়েদের নাকে কেমন যেন লজ্জা-রঙা রঙ লাগতো। ঐ গানের মধ্যে কি এমন মানে থাকতে পারে বুহুস বুঝতো না ; বোঝবার চেষ্টা করেও বুঝতো না। এবং বুঝতে না পেরে আরো অস্বস্তি বোধ করত।

ভিড় ছেড়ে উঠে বুহুস দীঘির উঁচু পাড় ধরে একা একা হাঁটতে লাগল।

দীঘি কি দীঘি! এপার ওপার দেখা দেখা যায় না। কবে নাকি এখানকার কোন্ জমিদারের বৃদ্ধা মাকে ছেলেরা বলেছিল যে, মা তুমি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি যতখানি হাঁটতে পারবে, এক একদিকে তার সমান দৈর্ঘ্য রেখে আমরা তোমার স্মৃতিতে দীঘি কেটে দেব।

জল সব সময় স্থির—কালো—অথৈ।

দত্তকাকা মাছ ধরার জন্যে ছিপ ফেলে বসে আছেন। ফাৎনার উপরে এক জোড়া কমলারঙ ফড়িং পিড়িং পিড়িং করে হাওয়ায় সেতার বাজাচ্ছে। এখানে নাকি একমণ দেড়মণ মাছ আছে। সেই ভয়েই ত বুহুসের এ দীঘিতে কোনোদিন স্নান করা হল না। চান করতে নামলে ওই সব মাছ যদি কোনক্রমে পেটে এসে মোটা মাথা দিয়ে ঢুঁ মারে তাহলেই ত অবস্থা কাহিল।

অনেকে বলেন, এই মাধবপাশা দীঘিতে নাকি জিন পরী আছে। একা একা এই দীঘির পাড়ে চাঁদনী রাতে কেউ এলে তাকে নাকি জিন পরীরা ভুলিয়ে নিয়ে ডুবিয়ে মারে।

জিন কি জিনিস বুহুস জানে না! তবে পরী দেখবার ইচ্ছা আছে। মানী মাসীমার বাড়ির পাশের বাড়ি বিষ্টুদার বন্ধু গোবিন্দর ছোট বোন ছিল, তার নাম চামেলি। ভারী ভাল দেখতে মেয়েটিকে। মানী মাসীমা বলতেন মেয়ে ত নয় যেন ডানাকাটা পরী। বুহুসের মনে মনে একবার ডানাওয়ালা পরী দেখার ইচ্ছা আছে।

চামেলি খুব ভাল সাঁতার কাটতে পারে। মানী মাসীমাদের পুকুরে চিৎ সাঁতার কাটতে কাটতে নক্সীকাঁথা সেলাই করে। জলের উপর ওর ধবধবে শরীরের কিছুটা আর কমলা রঙ পায়ের পাতাটা

ওঠে নামে ও যখন সাঁতার কাটে, আর বুড়সের মনে হয় কোনো হুধলি হাঁস বুঝি জলে বিলি কাটছে।

তবে মাধবপাশার দীঘিতে চামেলি কেন অন্য কেউই সাঁতার কাটতে সাহস পায় না। তার কারণ, এ ত দীঘি নয়; সমুদ্র। ষ্টিমার চলতে পারে এতে স্বচ্ছন্দে!

বুড়স একা একা চুপ করে দীঘির পাড়ে ফলসাগাছের নীচে বসে থাকে। ফলসাগাছের ঘনপাতার আড়ালে বুলবুলি শীস দেয়—দীঘির অন্যদিকের পাড়ের উপর দিয়ে উড়ে এসে এক ঝাঁক সল্লি হাঁস ঝুপ্ ঝুপ্ সুস্ করে এক-এক করে জলে নামে—ওদের ছড়িয়ে পড়ার চমক লেগে ভোরের রোদ্দুরে হীরের টুকরোর মত ছিটকে-ওঠা জল ঝিক্‌মিক্ করে। একটা অলস হাওয়া বয়—দণ্ডকাকার ছিপের ফাৎনা দোলে, ফড়িংগুলোর মনোসংযোগ নষ্ট হয়—মাধবপাশার কালো জলে শিউলিদিদির চুলের মত আলতো ঢেউ জাগে। বুড়স বসে বসে ভাবে। একা একা, একা একা, একা একা; কত কি ভাবে।

একা থাকলে বুড়সের গান গাইতে ইচ্ছে করে আজকাল। গান ত বুড়স কখনো শেখেনি। তেমন গাইতে পারেও না। কিন্তু যখন কাছে পিঠে কেউ কোথাও থাকে না তখন বুড়স গুন গুন করে গান গায়। বুড়স ভাবে ভালোলাগার গান অন্য গান—সে ত আর শিখে গাইতে হয় না। ভালো লাগলে—বেঁচে থাকতে ভালো লাগলে কোন একটি বিশেষ মুহূর্তকে ভালো লাগলে, সেই মুহূর্তে কার না গান গাইতে ইচ্ছে করে? সে গাইতে পারুক আর নাইই পারুক।

সেদিন এক কাণ্ডই হয়েছিল। জেলা-স্কুলে বুড়সদের ক্লাস হচ্ছে। এমন সময় বেয়ারা নোটিশ নিয়ে এলো—ক্লাসের পর হেড-স্যার ডেকেছেন। শুনে ভয়ে বুড়সের গলা কাঠ। হেডস্যার কাউকে বেত-টেত মারা ছাড়া সচরাচর ডাকেন না। আর বরিশাল জেলা স্কুলের তখনকার হেডস্যারের মত রাসভারী, সম্মানিত লোক খুব কম ছিলেন।

কিছুদিন আগে বাবার সঙ্গে বুড়স মোটর লঞ্চে করে ভোলায়

বেড়াতে গেছিল। সঙ্গে অনেকে ছিলেন। শহরের একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, সিভিল সার্জন, এ. ডি. এম. এবং হেডস্যারও। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেছিল। জ্যোৎস্না ছিল। একটা চরের পাশে লঞ্চ নোঙর করা হয়েছিল খাওয়া-দাওয়ার জন্যে—এমন সময় কে যেন বললেন, আসুন আমরা গান গাই। তারপরেই কোরাস্। 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'।

বুহুস বুঝতে পারেনি যে, অন্যমনস্ক হয়ে কখন বুহুসও ওঁদের সকলের সঙ্গে গাইতে শুরু করে দিয়েছে। গান থামলে—বাবা বললেন, তুই ত বেশ ভাল গান গাস রে বুহুস। হেডস্যার মুখে কথা বললেন না। হাসি-হাসি মুখে বুহুসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। গান থেমে যেতেই বুহুস লজ্জায় এক শেষ। হেডস্যার কি না কি ভাবলেন।

হেডস্যার কেন ডেকেছেন জানার উপায় নেই।

ক্লাসের পর ছুরুছুরু বুকে বুহুস হেডস্যারের ঘরের ভারী পরদার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, মে আই কাম্ ইন্ স্যার?

হেডস্যার ভারী গলায় বললেন, কাম্ ইন্।

বুহুস ঘরে ঢুকে মিনমিনে গলায় বলল, আপনি আমাকে ডেকেছিলেন? বিরাট টেবলের পেছনে একটি উঁচু হাতলওয়ালা চেয়ারে-বসা হেডস্যার মুখ তুলে বললেন, হুঁ। ডেকেছিলাম। আগামী কাল স্কুলের ডিবেট হবে। উঁচু ক্লাসের ছেলেরা করবে—তোমায় ওপেনিং সং গাইতে হবে।

বুহুস বলল, স্যার? মানে—। কিছু বলতে পারল না—গলা কেঁপে গেল, দুবার ঢোক গিলল।

হেডস্যার বললেন, হুঁ। এখন যাও। কাল ক্লাশ ছুটির পর আমার সঙ্গে দেখা করবে।

সেদিন বাড়ি ফেরার পর মাকে এই রোমহর্ষক খবরটা দিতেই মা পাশের বাড়ি থেকে হারমনিয়ম চেয়ে পাঠিয়ে বুহুসকে ঐ গানটা ভাল করে তুলিয়ে দিলেন।

বুহুস কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, অত লোকের মধ্যে আমি গাইতে

পারবো না মা—তুমি বাবাকে বলো যেন হেডস্যারকে বলে দেন।

অফিস থেকে বাবা ফিরতে বাবার কাছে মা আর্জি পেশ করলেন। বাবা সঙ্গে সঙ্গে খারিজ করে দিলেন। বললেন, কেন? ও তো ভালই গায়, তাছাড়া এমনি করে লজ্জা না ভাঙলে কি চলে? সারাজীবন কুনো হয়ে থাকলে চলবে কেন? স্মার্ট হতে হবে।

সে রাতে ভয়ে বুতুসের ঘুম হল না।

পরদিন ক্লাসে কি কি পড়া হল তাও বুতুস জানলো না। স্কুল ছুটির পর হেডস্যার ওকে নিয়ে হল্-এ এলেন। বুতুস দেখল ছেলেতে, ঘর ভর্তি। সব ক্লাসের ছেলেরা আছে। যুদ্ধ ভাল কি না এই নিয়ে ডিবেট হবে। ঘরের মধ্যে বড় টেবল। টেবল-ক্লথ পাতা—ফুলদানীতে ফুল সাজানো। ইংরিজীর স্যারেরা বসে আছেন। হেডস্যার নিজে মধ্যের চেয়ারে বসে বুতুসকে এগিয়ে দিলেন, সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

একটি ক্লাস টেনের ছেলে বুতুসের নাম বলল—বলল এবার ওপেনিং সং গাইবে বুতুস।

হঠাৎ বুতুসের মনে হল বুতুস কোনদিন জীবনে কোন গান শোনেনি—কাউকেই কোন গান টান গাইতে শোনেনি—নিজে ত গায়ইনি—বুতুসের গলার কাছে একটা কোলা ব্যাঙ যেন কোথা থেকে এসে ছিপির মত কণ্ঠনালিটা আটকে দিল।

বুতুসের ইচ্ছা হল, এক লাফে দৌড়ে পালিয়ে যায় স্কুল ছেড়ে—আর কোনদিন ফিরে আসবে না বলে।

কিন্তু হেডস্যার ভারী গলায় বললেন, স্টার্ট—যেন স্যার হানড্রেড মিটারস্ রানের স্টার্টার, তেমন বললেন, গেট-সেট, রেডি, স্টেডি; গো। বুতুস হানড্রেড মিটারস্ রানের মতই গানটা আরম্ভ করেছিল, ভেবেছিল, কোন রকমে এক দৌড়ে যদি শেষ করে দিতে পারে—।

কিন্তু গান গাওয়া আর দৌড়নো ত এক নয়। অতএব যা বুতুসের কপালে ছিল তাই হল। দম ফুরালে গ্রামোফোনের রেকর্ড যেমন করে আস্তে আস্তে থেমে যায় বুতুস তেমন করে আস্তে আস্তে

থেমে গেল। তখন বুহুস ঐ জায়গাটা গাইছিল, ঐ যে, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।

থেমে গেলে আবার দম না দিলে আর রেকর্ড চলে না। কিন্তু বুহুসকে দম দেবার জন্যে এত ছেলে ও স্যারেরা বসে নেই। তারা ডিবেট করতে ও শুনতে এসেছে। বুহুস এতদিন হেডস্যারকে খুব রাগী বলে জানত। সেই মুহূর্তে বুহুসের হেডস্যারের মুখটাকে যীশুখ্রীষ্টের মুখের মত মনে হল। হেডস্যার ওকে ক্ষমা করে বললেন, বাড়ি যেতে ইচ্ছে করলে বাড়ি যাও।

বুহুস দৌড়তে দৌড়তে সোজা বাড়ি এসে বইপত্র খাটের উপর ছুঁড়ে ফেলে উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। এর চেয়ে হেডস্যার বুহুসকে একা ঘরে ডেকে নিয়ে বেত মারলে বুহুস অনেক খুশী হত।

বাবা বাড়ি ফিরলে, মা বাবাকে খুব বকলেন। তুমি ছেলেটাকে মিছিমিছি অপদস্থ করালে। ও ত বলেই ছিল, পারবে না।

বাবা বললেন, তাতে, কি হয়েছে। প্রথমবার অপদস্থ হয়েছে পরে নিশ্চয়ই পারবে—। 'Failures are the Pillars of Success'। বুঝেছ বুহুস। জীবনে কোন কিছুই একেবারে এবং প্রথমবারেই শেষ হয়ে যায় না। আমি জানি তুমি একদিন সভাতেও গাইতে পারবে, এবং ভালই পারবে।

ভবিষ্যতে কি পারবে তা বুহুস জানে না। কিন্তু স্কুলের ছেলেরা পরদিন থেকে তার পেছনে লেগে গেল। বুহুসের নাম দিয়েছে "ধূম্র পাহাড়।" কেউ কেউ আবার বলে "ক্যাল্‌কেশিয়ান ধূম্র পাহাড়"। কেন বুহুস জানে না, তার উপর এদের সকলেরই ভীষণ রাগ। এবং সেই কারণে কলকাতার লোকেদের উপরেও রাগ। কী লজ্জা কি লজ্জা। বুহুস একেবারে মরমে মরে থাকে।

অশত্থগাছের তলা থেকে দত্তকাকিমা চেঁচিয়ে ডাকলেন—ও বুহুস একা একা কি করছ বসে বসে—দৌড়ে এসো। সবাই খেতে বসে গেছে।

বুতুস ভুলেই গেছিল যে, বুতুসরা মাধবপাশায় পিকনিক করতে এসেছে। বুতুসকে উঠতে দেখে ফলসাগাছের পাতার আড়াল ছেড়ে বুলবুলিটা ভর-র-র-র্-র্ করে উড়ে গেল। দীঘির পাড় থেকে একটা গোরু ডাকল, হাম্বা। বুতুস ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল, যেদিকে সকলে খেতে বসেছে

এমনি করে বরিশালের দিন কাটতে লাগল। একটি একটি করে। সকাল থেকে রাত—বাঁধা রুটিনে—। দেখতে দেখতে অনেক দিনই পার হল বুতুস। এখন প্রায় কবে এসেছে, তা মনেই পড়ে না বুতুসের।

জেলা স্কুলে একরামুদ্দিন, করিম, এনায়েতুল্লা সব একসঙ্গে পড়তো বুতুসের ক্লাসে। ওরা সকলে মহম্মদ ইক্‌বালের "সারে জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা, ম্যায় বুলবুলে হ্যায় উসকি, ইয়ে গুলিস্তাঁ হামারা হামারা," গানটিকে হিন্দুস্তাঁর বদলে পাকিস্তাঁ বলে গাইত মাঝে মাঝে। তখন বুতুস বুঝতে পারত যে দেশ ভাগাভাগির ব্যাপারটা বেশ দ্রুত এগোচ্ছে, নইলে এখানের ছোট বড় সকলের মধ্যে এমন উত্তেজনা দেখা যেত না।

দেশ স্বাধীন হলে কি হবে বুতুস জানে না। শুধু জানে সেজকাকুদের মত অনেক অনেক লোককে দাড়ি গোঁফ রেখে এ শহর থেকে ও শহরে কুকুরের মত পালিয়ে বেড়াতে হবে না—দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে সেজকাকুর আবেগ ভরা গলায় 'বঙ্গ আমার জননী আমার মাতৃ আমার, আমার দেশ,' গান গাওয়া সফল হবে, ছেলেদের তীর-ধনুক ছোঁড়া শেখানো সার্থক হবে, এত লোকের এতদিনের স্বার্থত্যাগ সফল হবে। যেখানে সেখানে সাহেবরা আর নিছক সাহেব বলেই লাথি মেরে, ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াতে পারবে না।

আমাদের দেশ আমাদের হবে।

টিফিনের সময়ে নদীর পাশে যেখানে জেলেরা গাব মাখিয়ে জাল শুকুতে দিত—যেখানে নৌকোগুলোকে কুমিরের মত উপুড় করে শুইয়ে

মেরামত করত—সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াত বুতুস—একা একা। কোনো দিন বা ব্যারনের দোকানে গিয়ে শরবৎ খেত। বুতুসের ভাল লাগত না। ক্যালকেশিয়ান বুতুসকে বরিশাল ভাল মনে নিতে পারেনি যেন। কী হিন্দু কী মুসলমান, ছেলেগুলোর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারত না। হয়ত সত্যিই ছোটবেলা থেকে ও কলকাতায় মানুষ বলে অথবা সত্যি সত্যিই কলকাতার লোকদের প্রতি ওদের কোনো স্বাভাবিক বিরূপতা ছিল বলে। বরিশালে এতদিন এসেও সত্যিকারের কোনো বন্ধু হলো না বুতুসের।

সেকালে প্রায়ই নদীর পাড়ে আসতো বুতুস। মা পাঠাতেন। বিশেষ করে যেদিন বিষ্ণুদা বেড়াতে আসত বুতুসদের বাড়ি, সেদিন মা বলতেন, যা, মাছ কিনে নিয়ে আয়।

বুতুস বিষ্টুদার সঙ্গে ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টিতে দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে নদীর পাড়ে দাঁড়াত, রুপোলি ইলিশে নৌকো ভরে জেলেরা ফিরে আসত। ছ' আনা থেকে আট আনা করে সের। একটি কি দুটি ইলিশ কিনে আবার ওরা ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ফিরে আসত। কাঁচালঙ্কা আর কালোজিরে দিয়ে মা ইলিশমাছের ঝোল রাঁধতেন। কখনো কখনো দই-ইলিশও হত; একদিন ভাপা ইলিশও রেঁধেছিলেন মা। এখনো মুখে সে স্বাদ লেগে আছে; নাকে সে গন্ধ। জর্ডন কোয়ার্টারের সেই লাল-রঙা বাড়িটার কথা মনে পড়লেই নাকে ইলিশের গন্ধ পায় বুতুস।

এখানে মাঝে মাঝেই বুতুসের কান্না পেত। বিশেষ করে বিকেলে। দুপুরে এক-দু পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর খোয়া-ঢালা লাল রাস্তাটা যখন বিকেলের সোনা রোদে হেসে উঠত, পেঁপেগাছের সবুজ জল-ভেজা পাতায় বসে যখন শালিক গুলো কিচির মিচির করত তখন বুতুসের কান্না পেত। কখনো কখনো এষার কথাও মনে পড়ত। এষা কি বুতুসকে মনে রেখেছে না ভুলে গেছে? কে জানে?

এষা কিন্তু একটাও চিঠি লেখেনি বুতুসকে। সে জন্যে মাঝে মাঝে বুতুসের রাগও হয়। বুতুস ভেবেছিল আগে এষা লিখবে।

আসলে ও এখানে এসে অনেকদিন বাড়ির ডাকবাক্সে অধীর আগ্রহে হাত গলিয়েছে দুরু দুরু বুকে। কোনোদিনও বুতুসের জন্যে কোনো চিঠি আসেনি এষার কাছ থেকে। শূন্য মুঠি উঠেছে প্রতিবারই। একদিন শুধু একটা কালো ঠাণ্ডা টিকটিকি উঠেছিল। এষার চিঠির বদলে এমন একটা ঠাণ্ডা নরম ঘিনঘিনে বিফলতা হাতের মুঠিতে ধরতে হবে, তা বুতুস ভাবেনি। তারপর থেকে এষার চিঠির প্রত্যাশাও আর করেনি। মনে মনে শুধু রাগ আর অভিমান পুষে রেখেছে এষার জন্যে।

একদিন হঠাৎ অভাবনীয় ভাবে সেই দিনটি এসে গেল। বিনা নোটিসে বাবা অফিস থেকে ফিরেই বললেন, চলো বুতুস, কলকাতা। পনেরোই অগাস্ট দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। সরকারি চাকুরেদের অপশান একসারসাইজ করতে হবে। 'অপশান' মানে বুতুস জানতো না। পরে অভিধানে পেয়েছিল। মানে, সরকারি চাকুরেদের কে কে পাকিস্তানে থাকবেন, আর কে হিন্দুস্থানে তা ঠিক করে পনেরোই অগাস্টের অনেক আগেই জানিয়ে দিতে হবে।

তারপর, অগাস্টের প্রথমের এক বিকেলে, বরিশাল থেকে বিদায় নিয়ে, মা বাবার সঙ্গে বুতুস ষ্টিমার ঘাট থেকে গারো ষ্টিমারে উঠে বসল।

মানী মাসীমা আসবার আগে অনেক আদর করে খাইয়ে ছিলেন। মেশোমশাই বলেছিলেন, কোথায় আর যাব বল্ আমরা? এত পুরুষের ভিটে ছেড়ে? অন্য কোথাও যাবই বা কেন? বরিশালই ত আমাদের দেশ। বরিশাল ত ভারতবর্ষেরই একটি অংশ। জিন্নাসাহেব নেহেরু-সাহেব যখন দেশ ভাগ করেছেন আমাদের মত অনেকের কথা ভাল করে ভেবেই নিশ্চয়ই করেছেন।

বিষ্ণুদা কিন্তু কথা শুনে হেসেছিল। বলেছিল, জানিনা রে, কিছুই জানি না। বুঝলি কিনা বুতুস। তোরা যখন সুখে থাকবি কলকাতায় তখন আমাদের কথা মনে রাখিস! রাখবি ত?

বুতুস বলল, তোরা কি সুখে থাকবি না?

বিষ্ণুদা বলল, জানি না। হয়ত থাকব। সুখে হোক, দুঃখে হোক থাকব। তবে তোকে একদিন ঈজ্জতের কথা বলেছিলাম না, ঈজ্জত নিয়ে যেদিন থাকতে পারব না সেদিন থাকব না।

বুতুস অবাক হয়ে বলেছিল, মেসোমশায় মাসীমা না এলেও তুই একা চলে আসবি ?

বিষ্ণুদা হেসেছিল। বলেছিল আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকের মতই বাবার কোনো নিজস্ব মতামত নেইরে বুতুস—থাকলে আমার এই বয়সে এত মাথাব্যথা ছিল না।

একসময়ে গারো ষ্টিমারের ভোঁ বাজল। জোরে। বুতুসের মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। এতক্ষণ কলকাতায় যাবে—পুরানো চেনা কলকাতায় যাবে—এই আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিল কিন্তু ঠিক যাবার মুহূর্তে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভারী খারাপ হয়ে গেল।

বিষ্ণুদা, মানী মাসীমা—সকলে জেটিতে দাঁড়িয়েছিলেন। বিষ্ণুদা চেঁচিয়ে বলল, আমাদের মনে রাখিস বুতুস—তোর কথা আমার সবসময় মনে থাকবে।

বুতুস কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর রেলিংএ ঝুঁকে বলল, সত্যিই যদি আসিস, ত চলে আসিস কলকাতায় বিষ্ণুদা। আমরা ত আছি।

বলেই বুতুসের সেই গল্পটির কথা মনে হল। একজন আধাসাহেব ফিরিওয়ালা ক্যানারী পাখি ফিরি করছিল ষ্টিমার ঘাটে। ষ্টিমার ছাড়বে ছাড়বে। পাখিওয়ালা একটি পাখি বেচল একজনের কাছে—। বলল, পাখি এমন গাইবে যে তা বলার নয়। খরিদ্দার তাকে একটি টাকা দিল। যেই না ষ্টিমার ছাড়ল অমনি পাখিওয়ালা হাত নেড়ে বলল, সাহেব, The bird will never sing. তখন সেই খরিদ্দার রেলিংএ ঝুঁকে পড়ে বলল ; And the coin will never ring.

বুতুসের মনে হল, বিষ্ণুদা ওকে কিন্তু সেই ফিরিওয়ালার মত ঠকায়নি। ষ্টিমার ছাড়ার মুখে ওকে একটি সত্যি পাখি, একটি নরম ভালোবাসার পাখি দিয়েছিল। কিন্তু জোচ্চোর খরিদ্দারের মত বুতুস

বিষ্ণুদাকে মিথ্যে আশ্বাস দিল, বলল, "আমরা ত আছি"।

বুহুস জানে, কোলকাতায় সাতদিন কোন অতিথি বাড়িতে থাকলেই অসুবিধা হয় লোকের—সকলের। কোলকাতার এমনই জীবন—এমনই সীমিত ও সামান্য সময় ও শক্তির জীবন সকলের।

"আমরা ত আছি" কথাটার মত মিথ্যা কথা আর কিছু নেই। আসলে বিষ্ণুদাদের কেউই নেই। মানে রইল না। যদি সত্যিই কোনোদিন দেশের মাটি ছেড়ে এতদিনের রীতিনীতি—এতদিনের পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে কোলকাতায় চলে আসতেই হয়, তবে বিষ্ণুদারা এসে দেখবে যে, এত বিরাট অথচ এত বড় হৃদয়হীন শহর আর নেই। এখানে ইচ্ছে থাকলেও কেউই কারো জন্যে কিছুই করতে পারে না। বেশীদিন এখানে থাকলে কিছু করার ইচ্ছেও হয়ত মরে যায়।

ষ্টিমারটি জেটি ছেড়ে গভীর জলে সরে আসতে লাগল।

ষ্টিমারটি ধীরে ধীরে গভীর জলে চলে এল। তারপর খুলনার পথে চলতে স্নুরু করল। বুহুস রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে শেষবারের মত একবার বরিশালকে দেখে নিল।

বিকেলের শান্ত নরম আলো, নারকোল স্নুপুরীর চুলে আল্‌তো আদর ছোঁওয়াচ্ছে—অনেকগুলো কাক একসঙ্গে দল বেঁধে উড়ছে—ঘুরে ঘুরে উড়ছে। উড়ে উড়ে ওরা কি যেন বলছে।

বিষ্ণুদা যেন হাত নেড়ে কি বলল—বুহুস শুনতে পেলো না—। নদীর হাওয়ায় বুহুসের চুল এলোমেলো হচ্ছিল। নদীর হাওয়ায় বুহুস শেষ বারের মত বরিশালের বড় বড় রুপোলি আঁশ-ওয়ালা ইলিশের গায়ের গন্ধ পেল—বিষ্ণুদাকে শেষ বারের মত হাত নাড়তে দেখল।

তারপর আর কিছু দেখা গেল না। আর কিছু শোনা গেল না—নদীর জোলো জোলো নোনা হাওয়াটা শুধু ষ্টিমারের ডেকময় হুটোপুটি করে বেড়াতে লাগল। দিনশেষের ম্লান, নিথর, গোলাপি নদীর দিকে চেয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে বুহুস একা একা দাঁড়িয়ে রইল।